মুক্তির পথ ইসলাম

আবদুস শহীদ নাসিম

মুক্তির পথ ইসলাম

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

মুক্তির পথ ইসলাম
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-056-9
শ. প্র. : ৭০

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৪ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০ ঈসায়ী

কম্পোজ
Saamra Computer

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Muktir Path Islam (Islam : The Path of Emancipation) By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone: 8311292, 01753422296. 1st Edition : July 2004, 2nd Edition : December 2010.

Price Tk. : 120.00 Only

আমাদের কথা

এ বইটি যুব সমাজের উদ্দেশ্যে লেখা।

২০০৪ সালে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিল ওয়ার্ল্ড এসেমব্লি অব মুসলিম ইয়থ-WAMY বাংলাদেশ অফিস।

এখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে বইটির প্রথম দিকে আরো চারটি অধ্যায় সংযোজন করে বইটিকে আরো অনেক সমৃদ্ধ ও ফলদায়ক করা হয়েছে।

যে কোনো মত পথ ও যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী যুবকরাই বইটি পড়তে পারেন। আশা করি সকলেই এ বইতে চিন্তার খোরাক পাবেন।

মানুষ অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় বিধ্বস্ত। দুর্বীষহ জীবনে অতীষ্ঠ। বিশ্বব্যাপী মানুষ জীবনের মুক্তি সন্ধান করছে।

এ কালের বড় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন : 'এ পৃথিবী এখন মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মানুষকে বাঁচতে হলে এ পৃথিবী ছাড়তে হবে। অন্য কোনো গ্রহে আবাস খুঁজতে হবে।'

কুরআনেও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ উল্লেখসহ। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ বলেন: 'পৃথিবীর জলে স্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে মানুষেরই কর্মকাণ্ডের ফলে।'

স্টিফেন হকিং মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী আল কুরআন পড়লে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে জানতে পারতেন : ১. এ পৃথিবী অবশ্যি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অন্যান্য গ্রহও। ২. পৃথিবী ও মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অবতীর্ণ বিধান মতো জীবন যাপন করলে এ পৃথিবীতেই মানুষ সুখী ও প্রাচুর্যের জীবন যাপন করতে পারে।

এ বইতে খুব সংক্ষেপে মানুষের শান্তি ও মুক্তির পথ আলোকিত করা হয়েছে। এ বই পড়ে যে কেউ স্বাধীনভাবে নিজের জীবন চলার পথ বেছে নিতে পারেন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ডিসেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

১

শান্তি মুক্তি ও ইসলাম

১. বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও অশান্তির ধরণ

বিশ্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করেছে মানুষ। অশান্তি মানুষেরই সৃষ্টি। অশান্তি মানুষেরই কর্মফল। বর্তমান বিশ্বে বিরাজিত অশান্তির ধরণ ও রূপ বর্ণনা করে শেষ করা কঠিন। কয়েকটি বড় বড় অশান্তি নিম্নরূপ :

০১. মানুষের মানসিক অশান্তি, মানসিক যন্ত্রণা ও দাহ।
০২. ক্ষুধা, দারিদ্র, অভাব।
০৩. মারাত্মক রোগ ও মরণ ব্যাধির বিস্তার।
০৪. দাম্পত্য কলহ, বিরোধ, বিচ্ছেদ, বৈধব্য।
০৫. পারিবারিক বিশৃংখলা ও চরম অশান্তি।
০৬. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ, জবরদখল।
০৭. ঘুষ, চাঁদাবাজি।
০৮. ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ফাঁকিবাজি।
০৯. হিংসা বিদ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ, হানাহানি, খুনাখুনি।
১০. যৌতুকের যাঁতাকল।
১১. নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ব্যভিচার, যৌন হয়রানি এবং নারীর অধিকার হরণ।
১২. বেকারত্ব।
১৩. অবাধ্যতা, উশৃংখলা।
১৪. যুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার।
১৫. মিথ্যাবাদিতা, ওয়াদা খেলাফি, চুক্তিভঙ্গ।
১৬. দমন, নিপীড়ন, বিদ্রোহ।
১৭. আগ্রাসন, অবরোধ।
১৮. সন্ত্রাস।
১৯. যুদ্ধ।
২০. নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা।
২১. মানবাধিকার পদদলন।

২২. বিপথগামিতা।
২৩. মাদকাসক্তি/নেশা।
২৪. সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতা।
২৫. জীবনের নিরাপত্তাহীনতা।
২৬. হত্যা, আত্মহত্যা, অন্তর্ঘাত, নারীর জীবনাহুতি।
২৭. সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা।
২৮. খেয়ানত, অবিশ্বস্ততা, আত্মস্যাৎ।
২৯. মন্দা, উৎপাদন ঘাটতি, সম্পদের স্বল্পতা, টাকার প্রবাহ, দুষ্প্রাপ্যতা।
৩০. পরিবেশ দুষণ।
৩১. অপচয় অপব্যবহার।

শুধু এগুলোই নয়, এর বাইরেও রয়েছে অশান্তির অসংখ্য ইন্ধন। আর আমাদের জানা অজানা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, ছোট বড় এসব অশান্তির ইন্ধনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষের মনের শান্তি, ঘরের শান্তি, সামাজিক শান্তি, রাষ্ট্রীয় শান্তি এবং বিশ্বশান্তি। সব অশান্তির জন্যে দায়ী মানুষের কর্ম :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ •

অর্থ : স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেরই কৃতকর্মের দরূণ, যেনো তিনি তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন। এর ফলে হয়তো তারা ফিরে আসবে। -সূরা ৩০ আর রূম : আয়াত ৪১।

২. সর্বব্যাপী অশান্তির কারণ

সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট ব্যক্তি, আর সর্বোচ্চ ইউনিট এই বিশ্ব। ব্যক্তি থেকে নিয়ে গোটা বিশ্বব্যাপী জ্বলছে অশান্তির দাবানল। এতে নিরবে এবং সরবে দগ্ধ হচ্ছে প্রায় সবাই, সর্বত্র। দগ্ধ হচ্ছে নারী, দগ্ধ হচ্ছে পুরুষ, দগ্ধ হচ্ছে শিশু। অশান্তির দহন কতো রকম এবং কতো প্রকার তা আমরা বলে শেষ করতে পারবোনা। কিন্তু দহন যে গ্রাস করে চলেছে সবাইকে সে সত্য লুকাবার সাধ্য কার?

কিন্তু কিসের কারণে এই সর্বব্যাপী অশান্তি? কারা জ্বালিয়েছে এ আগুন? কারা ঢালছে তাতে তেল ফুয়েল কাঠখড়ি? হ্যাঁ, বিশ্বগ্রাসী অশান্তির অনিবার্য কারণগুলো হলো :

১. মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি মানুষের অবিশ্বাস অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞা।
২. আল্লাহদ্রোহীতা (আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি বিদ্রোহ)।

৩. আত্মার দাসত্ব (লাগামহীন কামনা বাসনা ও লালসার অনুগমন)।
৪. সীমালংঘন (transgression)।
৫. অহংকার, দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা।
৬. লোভ ও স্বার্থপরতা (ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা জাতীয় স্বার্থ)।
৭. নিষ্ঠুরতা, পাষন্ডতা, পাশবিকতা।
৮. অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা।
৯. পাপলিপ্সা, পাপাচার, অনাচার, কলুষতা।

যাবতীয় দুর্দশার প্রধান প্রধান কারণ হলো এগুলো। অবিশ্বাসী, অমান্যকারী, আল্লাহদ্রোহী, আত্মার দাস, সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, পাপাচারী নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও সমাজের কর্ণধারদের কারণেই পৃথিবীতে নেমে এসেছে আজ এতো অশান্তি, এতো গ্লানি, এতো দুঃখ-কষ্ট আর মানবতার প্রতি লাঞ্ছনা। এ প্রসঙ্গে দেখুন মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

অর্থ : যারা কুফুরি (অর্থাৎ তাদের স্রষ্টাকে অবিশ্বাস ও অমান্য) করবে, তাদের আমি পৃথিবীর ও পরকালের জীবনে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবেনা। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫৬।

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ •

অর্থ : তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র জীবিকা থেকে আহার করো। পৃথিবীতে সীমালংঘণ করোনা। তা করলে তোমাদের উপর আমার গজব অবধারিত হয়ে যাবে। আর যাদের উপর আমার গজব অবধারিত হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়। -সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৮১।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا •

অর্থ : ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার রায় কি- যে তার কামনা বাসনাকে নিজের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে-? তুমি কি তার পক্ষে ওকালতির দায়িত্ব নেবে? -সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৪৩।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ •

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে এবং সে সম্পর্কে অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে, তাদের জন্যে আকাশের দুয়ার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবেনা। -সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৪০।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ •

অর্থ : যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা প্রসারে উদ্যোগী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালেও। -সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ১৯।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ • عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ •

অর্থ : (তার আনুগত্য করোনা) .... যে কল্যাণের কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়-নিষ্ঠুর, কুখ্যাত। -সূরা ৬৮ আল কলম : আয়াত ১২-১৩।

৩. শান্তির উৎস কোথায়?

মানুষ শান্তিদাতা নয়, মানুষ শান্তি ও মুক্তির অন্বেষী। সুতরাং শান্তির অন্বেষীদের শান্তি চাইতে হবে শান্তি ও মুক্তি দাতার কাছে। যার কাছে শান্তি আছে এবং শান্তি লাভের ফর্মূলাও আছে।

কে তিনি- যার কাছে শান্তি আছে এবং যিনি মুক্তি দিতে পারেন? এর জবাব একটাই, আর তাহলো : যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং শান্তি ও মুক্তির অন্বেষী বানিয়েছেন। শান্তি কেবল তাঁরই কাছে আছে এবং কেবল তিনিই মানুষকে শান্তি ও মুক্তি দিতে পারেন। তাঁরই নাম আল্লাহ। শান্তির চাবিকাঠি তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে। তিনিই শান্তির উৎস এবং তিনিই মুক্তিদাতা :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ •

অর্থ : তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ (ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা) নেই। তিনিই একমাত্র সম্রাট, পুত পবিত্র। তিনিই শান্তি। তিনিই প্রশান্তি ও নিরাপত্তাদাতা। তিনিই রক্ষক। তিনিই প্রবল পরাক্রমশীল মহিমান্বিত। -সূরা ৫৯ হাশর : আয়াত ২৩।

সুতরাং মানুষকে শান্তি চাইতে হবে শান্তির উৎস মহান আল্লাহর কাছে। আর শান্তি লাভের জন্য তিনি যে ফর্মূলা বা জীবন পদ্ধতি দিয়েছেন সেটার অনুসরণ ও অনুবর্তন করতে হবে। তবেই মানব জীবনে নেমে আসবে শান্তির ফল্গুধারা।

৪. শান্তি ও মুক্তি লাভের শর্ত

এমন কিছু মৌলিক শর্ত বা গুণাবলী রয়েছে, যেগুলো গ্রহণ করা বা অর্জন করা শান্তি ও মুক্তি লাভের প্রাথমিক শর্ত। এগুলো ছাড়া কিছুতেই শান্তি ও মুক্তি লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেগুলো হলো :

১. মানুষের স্রষ্টা ও শান্তির মালিক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।
২. বিনীতভাবে এক আল্লাহর দাসত্ব করা এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণ করা।
৩. আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার এবং তাঁর শাস্তির প্রচণ্ড ভয় পোষণ করা।
৪. আল্লাহর পুরস্কার তথা জান্নাত লাভের দুর্নিবার আকাংখা পোষণ করা।
৫. মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবতার হিতাকাংখা ও কল্যাণ চেতনা।
৬. আত্মপূজা, আত্মার দাসত্ব, স্বার্থপরতা ও অবৈধ কামনা বাসনা থেকে মুক্ত পবিত্র দৃষ্টিভংগি।
৭. ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রাপ্তি নয়, পরকালের অনন্ত জীবনের মুক্তি আর সাফল্যই হবে জীবনবোধ ও জীবন চেতনার মূল চালিকা শক্তি।

এই শর্তগুলো প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ •

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে, সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেয়। -সূরা ১০৩ আল আসর : আয়াত ২ ও ৩।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ •

অর্থ : তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। -সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ২৩।

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا •

অর্থ : 'তুমি তাদের (নবীর সাথিদের) দেখতে পাচ্ছো, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি কামনায় অবনত আত্মসমর্পিত।' -সূরা ৪৮ আল ফাতহ : আয়াত ২৯।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

অর্থ : আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে জবাবদিহিতার জন্যে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত থাকে আর নিজেকে বিরত রাখে আত্মার (কামনা বাসনার) দাসত্ব থেকে, জান্নাতই হবে তার আবাস। -সূরা ৭৯ আন নাযিয়াত : আয়াত ৪০-৪১।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ •

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তবে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন সে, যে তোমাদের মাঝে অধিক আল্লাভীরু। -সূরা ৪৯ আল হুজুরাত : আয়াত ১৩।

৫. ইসলামই শান্তি এবং শান্তির আহ্বায়ক

ইসলাম শান্তির উৎস মহান আল্লাহর প্রদত্ত জীবন যাপন পদ্ধতি। মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যেই তিনি মানুষকে এই সুন্দর জীবন যাপন পদ্ধতি উপহার দিয়েছেন। আল্লাহই শান্তির উৎস। তিনি চান মানুষ শান্তিতে থাকুক। তাই তিনি মানুষকে শান্তির বিধান দিয়েছেন এবং মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করেছেন:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ •

অর্থ : আল্লাহ আহ্বান করছেন শান্তির আবাসের দিকে। আর তিনি যাকে চান সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। -সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ২৫।

শান্তির পথ প্রদর্শনের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাথে পাঠিয়েছেন শান্তির ম্যানুয়েল আল কুরআন :

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ • يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ •

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলো এবং একটি উন্মুক্ত কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগমণ করে, আল্লাহ তাদেরকে এর সাহায্যে পরিচালিত করেন শান্তির পথে। -সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ১৫-১৬।

আল্লাহর দেয়া আলো এবং উন্মুক্ত কিতাব হলো আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্র প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। যারা আল্লাহর রসূলকে এবং তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বা জীবন যাপনের ম্যানুয়্যালকে অনুসরণ করবে, তাদের সমাজেই নেমে আসবে শান্তির ফল্গুধারা এবং তারাই আস্বাদন করবে মুক্তির স্বাদ :

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

অর্থ : শান্তি লাভ করবে তারাই, যারা 'আল হুদা' (আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি) অনুসরণ করবে। -সূরা ২০ তোয়াহা, আয়াত : ৪৭।

ইসলামই শান্তি। ইসলামের একটি অর্থ শান্তি। শান্তিকে পুরোপুরি গ্রহণ না করলে এবং শান্তির মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ না করলে শান্তি লাভ করা যায় না। তাই মহান আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বা শান্তির মধ্যে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থ : হে বিশ্বাসীরা! তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো ইসলামে (শান্তির মধ্যে)। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৮।

ইসলাম তার শত্রু পক্ষ বা প্রতিপক্ষের সাথেও অশান্তি চায় না। সেজন্যেই প্রতিপক্ষ বিবাদ বা সংঘাত সৃষ্টি করতে চাইলে মুসলিমরা বলে থাকে: 'আমরা শান্তি চাই':

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থ : অজ্ঞরা যখন তাদের সাথে বিবাদ বিসম্বাদে জড়াতে উদ্যত হয়, তখন তারা বলে: 'আমরা শান্তি চাই।'-সূরা ২৫ আল ফুরকান,আয়াত : ৬৩।

রসূল সা. সালাত আদায়ের পর আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করতেন এ ভাষায়:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

অর্থ : হে আল্লাহ তুমিই শান্তি এবং শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই এসে থাকে।'

ইসলামের মহান শিক্ষা হলো একজন মানুষের সাথে আরেকজনের সাক্ষাত হলে তারা পরস্পরকে বলবে : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

অর্থ : 'আপনার/আপনাদের প্রতি শান্তি, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক।'

খলিফা উমর রা. কে খেজুর গাছের তলায় গভীর প্রশান্তির ঘুমে দেখতে পেয়ে রোম সম্রাটের দূত বলে উঠেছিল :

يَا عُمَرُ! عَدَلْتَ فَنِمْتَ

অর্থ : হে উমর! তুমি ইনসাফ করেছো, তাই ঘুমাচ্ছো প্রশান্তিতে।

৬. শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে কারা?

অক্ষম ব্যক্তির শান্তিতে বসবাস করা আর ক্ষমতাবানের শান্তিতে বসবাস করা এক জিনিস নয়। রাস্তাঘাটে বৃদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক মেয়েদের উত্যক্ত না করা আর সুস্থ সবল যুবকের উত্যক্ত না করাটা এক কথা নয়।

বিশ্বব্যাপী অশান্তির জন্যে মূলত দায়ী ক্ষমতাবান সবল গোষ্ঠী। অপরদিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে কেবল সবলরাই। দুর্বলরা খুব একটা অশান্তিও সৃষ্টি করতে পারে না, শান্তিও প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। দুর্বলরা স্বভাবত শান্তি প্রিয় এবং শান্তির পক্ষপাতী। তবে তারা সবল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের জন্যেও নিরুপদ্রব সহায়ক।

আমরা আসলে বলতে চাইছি, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল শান্তির উপায় উপাত্তের কথা আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্যে প্রয়োজন শান্তি প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাংখী একটি সবল শক্তিধর জনগোষ্ঠী। কারণ একটি সবল শক্তিধর জনগোষ্ঠীই কেবল বিশ্বকে ভাংতে এবং এতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে একটি সবল শক্তিধর জনগোষ্ঠীই কেবল বিশ্বকে গড়তে এবং এতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মূলত শক্তি এবং বলই সকল কাজে সাফল্যের চাবিকাঠি।

৭. শান্তি ও মুক্তির জন্যে চাই মৌলিক মানবীয় গুণাবলী

যারাই মানুষের শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে অবশ্যি নিম্নোক্ত পনেরটি মৌলিক মানবীয় গুণ বা এর অধিকাংশ বর্তমান থাকতে হবে। এগুলো নিরপেক্ষ মানবীয় গুণাবলী। এগুলো ছাড়া অশান্তি সৃষ্টির কাজও করা যায় না, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেয়া যায় না। গুণগুলো হলো:

১. সুস্পষ্ট জীবন-লক্ষ্য ও জীবন-উদ্দেশ্য।
২. নির্দিষ্ট জীবন-পদ্ধতি (life style) অনুসরণ।
৩. দুর্দান্ত সাহস আর অপরিসীম বীরত্ব।
৪. প্রবল হৃদয়াবেগ, স্বপ্নসাধ, মনোবাসনা ও উচ্চাশা।
৫. দৃঢ়তা, অটলতা ও অবিচলতা।
৬. পরিশ্রম প্রিয়তা।
৭. সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা।
৮. সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি।

৯. উদ্ভাবনী ক্ষমতা।
১০. সিদ্ধান্তগ্রহণ শক্তি।
১১. পরিস্থিতির অনুকূল কর্মপন্থা গ্রহণের বিচক্ষণতা।
১২. প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা।
১৩. ঐক্য, সংহতি ও সংঘবদ্ধতা।
১৪. বলিষ্ঠ ও প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃত্ব।
১৫. টীম স্পীরিট।

৮. শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করার অনিবার্য গুণাবলী

এমন কতিপয় মানবীয় গুণাবলী আছে, যেগুলো উপরে উল্লেখিত মৌলিক মানবীয় গুণাবলীকে কল্যাণমুখী করে দেয়ার জন্য অনিবার্য। উপরোক্ত গুণাবলীর সাথে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কল্যাণমুখী মানবীয় গুণগুলো যুক্ত হবে, তারাই হবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মানবগোষ্ঠী। গুণগুলো হলো :

০১. সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা।
০২. বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা।
০৩. ন্যায়পরায়নতা, সুবিচার ও নিরপেক্ষতা।
০৪. মানবতাবোধ ও উদার প্রশস্ত হৃদয়- মন।
০৫. আত্মসম্মানবোধ।
০৬. দয়া, অনুগ্রহ, বদান্যতা ও সহানুভূতি।
০৭. প্রতিশ্রুতি পালন।
০৮. ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যপ্রিয়তা।
০৯. আত্মসংযম।
১০. নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা।
১১. নির্মল নিষ্কলুষ মন ও আদর্শপ্রিয়তা।
১২. নিঃস্বার্থপরতা।
১৩. সদিচ্ছা।
১৪. মঙ্গলাকাংখা ও কল্যাণকামিতা।
১৫. আত্মমূল্যায়ন।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে সামষ্টিকভাবে এসব মৌলিক এবং অনিবার্য মানবীয় গুণাবলীর প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। সে কারণে মানবতার মুক্তি এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

পক্ষান্তরে অন্যদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী বর্তমান থাকার সাথে সাথে অশান্তি সৃষ্টির কারণগুলো (২ নম্বর পয়েন্টে বর্ণিত) বিদ্যমান থাকায় বিশ্ববাসী আজ অশান্তির কারাগারে বন্দী।

তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল সুশৃঙ্খল নর শার্দূল যুবক যুবতীর, যাদের মধ্যে একদিকে থাকবে শান্তি প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, অপরদিকে তারা হবে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী এবং অনিবার্য সহায়ক গুণাবলীতে বলীয়ান। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের চেতনায় মানব কল্যাণে তারা থাকবে সদা উজ্জীবিত :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা উত্তম কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরাই ঐসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অচিরেই দয়া ও অনুকম্পা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। -সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৭১।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। -সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ৩৫।

* * *

(২)

মুক্তির মহাসনদ আল কুরআন

১. মুক্তি ও সাফল্যের অর্থ

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জীবন অখণ্ড এবং দুনিয়া ও আখিরাত পরিব্যাপ্ত। পার্থিব জীবনে মানুষের দৈহিক মৃত্যু হলেও মানুষের আত্মার মৃত্যু হয় না। মানব জীবনকে পরকালেও মৃত্যুহীন রাখা হবে।

মানুষের পার্থিব জীবন খুবই হ্রস্ব এবং স্বল্প সময়ের। অপরদিকে আখিরাতের জীবন অনন্ত, মৃত্যুহীন :

وَمَا هَـٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

অর্থ: নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর জীবন একটা খেল তামাশার সময় মাত্র। অথচ আখিরাতের জীবন চিরন্তন। -সূরা ২৯ আনকাবুত : আয়াত ৬৪।

কুরআন বলে, মানুষের এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীবনটা হলো : প্রচেষ্টার, বিনিয়োগের, চাষবাষ ও বীজ বপনের। অপরদিকে আখিরাতের জীবন হলো : ফসল কাটার, ফল লাভের এবং ফল ভোগের।

পৃথিবীর জীবনে যার প্রচেষ্টা যেমন হবে, বিনিয়োগ যেমন হবে, যে ফলের বীজ সে বপন করবে, আখিরাতের জীবনে সেই রকম ফল ফসলই সে লাভ করবে এবং সেই ফল ফসলই সে ভোগ করবে।

তাই কুরআন বলে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীবনটাকে চূড়ান্ত আবাস এবং ভোগের জায়গা বানিয়ো না, বরং আখিরাতের মুক্তি, সাফল্য ও সুফল লাভের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রাখো। আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের লক্ষ্যে পৃথিবীর জীবনে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও, এর জন্যে ত্যাগ স্বীকার করো, এরি জন্যে জীবন লক্ষ্যকে একমুখী করে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাও, তবেই তুমি তোমার আখিরাতের সীমাহীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত হবে :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

অর্থ : আর যারা আখিরাতের মুক্তি ও সাফল্যের সংকল্প করে এবং এর জন্যে যেমন চেষ্টা সাধনা করা দরকার তা করে যায়, তারা যদি মুমিন হয়, তাহলে

এমন লোকদের চেষ্টা সাধনা (আল্লাহর নিকট) অবশ্যি কুবল হবে। -সূরা ১৭ বনি ইসরাইল : আয়াত ১৯।

ইসলাম বলে, মানুষের জীবন অবিনাশী। দৈহিক মৃত্যুর মাধ্যমে তার জীবনটা স্থানান্তরিত হয় মাত্র। পৃথিবীর জীবন তার গোটা জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাই পার্থিব জীবনের কল্যাণ প্রচেষ্টা যেমন তার জন্যে জরুরি, তেমনি, বরং তার চাইতে বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হবে আখিরাতের অনন্ত জীবনের মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণের জন্যে। এ কারণেই কুরআন উভয় জগতের কল্যাণের জন্যে দোয়া করতে শিখিয়েছে :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : আমাদের প্রভু! এই জগতেও আমাদের কল্যাণ দাও এবং পরজগতেও আমাাদের কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের মুক্তি দিও। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০১।

লক্ষ্য অর্জনের পথে মানুষ যতো কষ্টই করুক না কেন, তাতে রয়েছে আনন্দ ও প্রশান্তি। সুতরাং মুক্তি ও সাফল্যের অর্থ হলো :

১. পরকালের অনন্ত জীবনে আল্লাহর পাকড়াও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

২. পরকালের অনন্ত জীবন আল্লাহর সন্তোষ আর জান্নাতের সুখ বিলাসের মধ্যে অবস্থানের সুযোগ লাভ।

৩. পৃথিবীর জীবনে সকলের দাসত্ব ও শৃঙ্খল পরিহার করে এক আল্লাহর দাস হিসেবে প্রশান্তির জীবন যাপন করা।

৪. এই বিশেষ ধরনের জীবন যাপনের কারণে এ পথে যেসব দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবত আসে সেগুলোকে বৃহৎ মুক্তির লক্ষ্যে স্বাভাবিক বলে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যেমন সন্তানের জন্যে মায়ের কষ্ট। প্রিয়জনের জন্যে প্রিয়জনের কষ্ট। এই ধরনের কষ্টের জন্যে দুঃখ থাকে না, থাকে হৃদয়ের প্রশান্তি।

মূলত এটাই মানুষের প্রকৃত শান্তি, মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

২. কুরআন মুক্তির পথ দেখায়

মানুষের এই প্রকৃত শান্তি, মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের বার্তা নিয়েই নাযিল হয়েছে ইসলামের মূল সূত্র আল কুরআন :

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ • يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ •

অর্থ : তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এক আলো এবং সুস্পষ্ট কিতাব। আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে ঐসব লোকদের শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং তিনি তাঁর নিজের মর্জিতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। -সূরা ৫ আল মায়েদা : ১৫-১৬।

হাদিসে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ : اِقْرَأُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّه يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لاَصْحَابِه

অর্থ : আবি উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সা-কে বলতে শুনেছি: তোমরা কুরআন পাঠ করো। কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথিদের জন্যে মুক্তির সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। -সহীহ মুসলিম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدَبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوْا مَأْدَبَتَه مَاسْتَطَعْتُمْ ، اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللهِ وَالنُّوْرِ الْمُبِيْنِ وَالشِّفَاءِ النَّافِعِ ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِه ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَه •

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : অবশ্যি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে (উপাদেয় আত্মিক মানসিক খাদ্যের) দস্তরখান। তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর দস্তরখান থেকে (জ্ঞান) আহরণ করে। অবশ্যি এই কুরআন আল্লাহর রজ্জু, অনাবিল আলো এবং কল্যাণময় প্রতিকারক। যে কুরআনকে শক্ত করে ধরবে কুরআন তাকে রক্ষা করবে। যে কুরআনকে অনুসরণ করবে সে তার জন্যে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির উপায় হবে।’ -হাকিম।

ইসলাম মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। যারা এই জীবনে ইসলামের মূল সূত্র আল কুরআন পড়বে, বুঝবে, অনুসরণ করবে এবং কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, পরজীবনে কুরআন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে, তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

৩. কুরআন জীবন ও সমাজকে বদলে দেয়

কুরআন প্রসঙ্গে কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন :

اِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِه اٰخَرِيْنَ •

অর্থ : আল কুরআন এমন একটি কিতাব যার সাহায্যে আল্লাহ কারো উত্থান ঘটান এবং কারো পতন ঘটান। -সহীহ মুসলিম।

এর অর্থ কুরআন উত্থান পতনের নিয়ামক শক্তি। কুরআনকে ধারণ করলে কোনো জাতির উত্থান ঘটতে পারে। আবার কুরআনকে ছেড়ে দিলে কোনো জাতির পতন ঘটতে পারে। কথাটি ব্যক্তি এবং জাতির জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, এই কুরআনই আরব উপত্যকার মেষ পালকদের বিশ্ববিজয়ী জাতির আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। নিরক্ষর ক্রীতদাস, রাখাল, রাহাজন, মরু যাযাবর, গোত্রীয় কলহে বিধ্বস্ত এবং অজ্ঞতা ও অন্ধতায় নিমজ্জিত বিচ্ছিন্ন এক জনগোষ্ঠীকে এই কুরআনই শাশ্বত জ্ঞানে উদ্ভাসিত করে ঈমানের রজ্জুর নিবিড় বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছিল। এদেরকেই আল কুরআন জগত সেরা শাসক, দ্বিগ্বিজয়ী সেনাপতি, অসীম সাহসী ন্যায় বিচারক, নির্ভীক দুঃসাহসী দূত, নিবেদিতপ্রাণ দায়ী ইলাল্লাহ এবং নির্যাতিত মানবতার প্রাণের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছিল। এদেরকেই আল কুরআন বিশ্ব সেরা অধ্যাপক, দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, হাদিস বিশারদ, কুরআন ব্যাখ্যাতা, প্রকৌশলী ও সমরবিশারদ বানিয়ে দিয়েছিল। এরাই আবির্ভূত হয়েছিল মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে।

এ কুরআন ইতিহাসের রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে দিয়েছিল। এ কুরআনই পশ্চিমের রাবাত-কর্ডোভা থেকে পূর্বের ব্রুনাই-জাকার্তা পর্যন্ত এবং দক্ষিণ সাগরের সমগ্র উপকূল থেকে নিয়ে বরফে ঢাকা উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলোর মানব হৃদয়সমূহকে ঈমানের অনাবিল আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। সেই আলো ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে সর্বখানে। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে : اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

অর্থ : নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সব চাইতে সঠিক এবং টেকসই। –সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৯।

৪. আল কুরআন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা :

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আল কুরআন সম্পর্কে আমাদের সমাজে কল্পনা প্রসূত বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন :

১. কুরআন একটি ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।
২. ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন পাঠ করা সওয়াবের কাজ।
৩. কুরআন বুঝা এবং শিক্ষা দেয়া আলেম ওলামার কাজ।
৪. কুরআন ধর্মীয় মাসলা মাসায়েলের কিতাব।

৫. কুরআন বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সাধারণ মানুষের কুরআন বুঝার দরকার নেই, তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়।
৬. কুরআন মহাপবিত্র কিতাব। সবাই সব সময় এটি স্পর্শ করতে পারে না, করলে পাপ হয়। অজু করে পবিত্র হয়ে জায়নামাযে বসে এটা তিলাওয়াত করতে হয়। সম্মানের সাথে জুযদানে মুড়িয়ে মাথার উপর রাখতে হয়।
৭. কুরআন নামাযে পড়তে হয়, মরা মানুষের জন্যে পড়তে হয়, শবিনায় পড়তে হয়, খতম করলে সওয়াব হয়।
৮. দোয়া, তাবিজ, ঝাড় ফুঁকে এ কিতাব ব্যবহার করলে উপকার হয়।
৯. কুরআনের তফসির করা সাধারণের জন্যে নিষেধ। বুযুর্গ এবং বড় বড় আলেম উলামারা এটা করবেন।

এগুলো কুরআনের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ও সংকীর্ণ ধারণা। তবে এসব ভুল ও অসম্পূর্ণ ধারণার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং পরিবর্তন হতে থাকবে ইনশাল্লাহ। কারণ সত্য প্রকাশিত হবেই।

৫. কুরআন পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা

তাহলে প্রশ্ন হলো কুরআন কেমন গ্রন্থ? কি কাজের গ্রন্থ কুরআন?

আসলে কুরআনের একজন সচেতন পাঠক কুরআন পড়লেই বুঝতে পারেন, কুরআন মানুষের জীবন যাপনের এক পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং মানুষের মুক্তির পথ। আল কুরআনে রয়েছে :

১. সৃষ্টিতত্ত্ব। জীবন তত্ত্ব।
২. স্রষ্টার পরিচয় এবং তাঁর প্রতি মানুষের কর্তব্যের বিবরণ।
৩. স্রষ্টার ইবাদত (উপাসনা) বিধি।
৪. আত্মোন্নয়ন বা মানবসম্পদ উন্নয়নের নির্দেশিকা (Human resource development guide) ও উন্নত নৈতিক গুণাবলীর বিবরণ।
৫. মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ব্যর্থতার নির্দেশিকা।
৬. জীবন ব্যবস্থা। জীবন যাপনের ম্যানুয়েল।
৭. উপদেশ, সুসংবাদ ও সাবধানবাণী।
৮. হালাল ও হারামের বিবরণ।
৯. দাম্পত্য সম্পর্ক ও পারিবারিক বিধান।
১০. পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ।
১১. উত্তরাধিকার বিধান।
১২. দাওয়াত ও তবলিগের নির্দেশ ও পদ্ধতি।
১৩. ন্যায়নীতির প্রসার ও অন্যায় দুর্নীতির প্রতিবিধান পদ্ধতি।

১৪. সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান।
১৫. আইন ও বিচার বিধান।
১৬. অর্থনৈতিক বিধান।
১৭. সমর বিধান।
১৮. বৈদেশিক সম্পর্ক বিধি।
১৯. ইতিহাস।
২০. সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য।
২১. মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ।

দেখুন, আল কুরআন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র কয়েকটি সুস্পষ্ট ঘোষণা:

مَا فَرَّطْنَا فِيْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : আমি এই কিতাবে কোনো বিষয়ই বাদ দেইনি।-সূরা ৬ আনআম : আয়াত ৩৮।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী। -সূরা ১৬ নাহল : আয়াত ৮৯।

৬. আল কুরআন মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে

মুলত ইসলামের মূল উৎস আল কুরআন নাযিল হয়েছে মানব সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে পরিবর্তন সাধন করতে। কুরআন বিপ্লব ঘটায় :

১. মানুষের চিন্তা, দৃষ্টিভংগি ও মনের মধ্যে (মানসিক বিপ্লব),
২. মানুষের চরিত্র, আচরণ ও জীবন পদ্ধতির মধ্যে (চারিত্রিক বিপ্লব),
৩. মানুষের সমাজ পদ্ধতি ও সমাজ কাঠামোর মধ্যে (সমাজ বিপ্লব) এবং
৪. মানুষের আইন, বিচার ও শাসন পদ্ধতির মধ্যে (রাষ্ট্র বিপ্লব)।

ইসলামের মূল উৎস আল কুরআন মানবতার মুক্তির বার্তা। এই বার্তা মুক্তির দুর্জয় আলোকচ্ছটা তীর্যক বেগে নিক্ষেপ করে মিথ্যা বাতিল ও অন্যায় অসত্যের গাত্রদেহে। এই আঘাতের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় পরাভূত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় মিথ্যা বাতিলের বর্ণালি প্রাচীর। মহান আল্লাহ বলেন :

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

অর্থ : বরং আমি সত্য (আল কুরআন) দিয়ে মিথ্যা-বাতিলের উপর আঘাত হানি। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তাতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। -সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ১৮।

মূলত কুরআন এই আঘাত হানে তার পাঠকের মন মস্তিষ্কে জমে থাকা বাতিল বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার উপর। তার ভ্রান্ত ও বিকৃত চরিত্র ও আচরণের উপর। পর্যায়ক্রমে এ আঘাতের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর। এরই পরিণতিতে মানুষ মুক্ত হয় সকল ধরনের ধ্বংসকর শৃঙ্খল থেকে। মানুষ পায় মুক্তির সাধ এবং প্রশান্ত চিত্তে এগিয়ে চলে সাফল্যের পথে।

৭. কুরআন দ্বারা মুক্তি ও সাফল্য লাভের শর্তাবলী :

মুক্তি লাভ করা মানে- জীবনকে অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, শাস্তি ও ধ্বংস থেকে মুক্ত করে জ্ঞান, শান্তি, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, পবিত্রতা, প্রশান্তি ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করা এবং ইহকালীন ও পরকালীন উভয় স্তরে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা। এর জন্যে প্রয়োজন পাঁচটি শর্ত পূরণ করা। সেগুলো হলো :

১. জ্ঞান (অর্থাৎ ধ্বংস ও মুক্তি এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিচয় ও পথ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও পথনির্দেশ লাভ করা)।
২. ঈমান (অর্থাৎ এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনা)।
৩. মুক্তির মরণপণ সংকল্প নিয়ে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলা।
৪. পরিপূর্ণ জীবনকে মুক্তির পথে পরিচালিত করা।
৫. মুক্তি পথে পর্বতের মতো অটল অবিচল থাকা।

জীবনকে প্রকৃত মুক্তি ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করার প্রক্রিয়া এটাই। এ প্রসঙ্গে দেখুন আল্লাহর বাণী :

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ •

অর্থ : তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা (যে কিতাব, জীবন ব্যবস্থা) নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য- যে এ ব্যাপারে অজ্ঞ-অন্ধ? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। -সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ১৯।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ •

অর্থ : তোমরা মুখ করো পূর্ব কি পশ্চিম দিকে, তা কোনো প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ হলো ঐ ব্যক্তির কাজ, যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি আল কিতাবের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭৭।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا •

অর্থ : মুমিনদের কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত অংগিকার পূর্ণ করেছে, তাদের কিছু লোক শাহাদত বরণ করেছে আর কিছু লোক প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করে নাই। -সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ২৩।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ •

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৮।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ •

অর্থ : যে সব লোক ঘোষণা করলো : 'আল্লাহ আমাদের রব' এবং তারা এ কথার উপর অটল হয়ে থাকলো, নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদের বলতে থাকে, ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না; আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছে। -সূরা ৪১ হামিম-আস্ সাজদা : আয়াত ৩০।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ •

অর্থ : যারা তাগুতের দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করলো এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলো, তাদের জন্যে সুসংবাদ, কাজেই হে নবী! সুসংবাদ দাও আমার এই দাসদের। -সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ১৭।

৮. ইসলামের অনুসারীদের পার্থিব মুক্তি ও সাফল্য

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদ সাক্ষ্য দিচ্ছে :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা (আল্লাহ্‌র স্মরণ ও কুরআন দ্বারা) প্রশান্তি লাভ করে, আর জেনে রাখো আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে। -সূরা ১৩ রা'দ : আয়াত ২৮।

• يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

অর্থ : যারা ঈমান আনে, আল্লাহ এক সুপ্রমাণিত ঘোষণার মাধ্যমে তাদেরকে ইহকাল এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। -সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ২৭।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

অর্থ : যারা ঈমান আনে, এবং ঈমানের সাথে কোনো প্রকার শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায় না, তাদের জন্যে রয়েছে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা, মূলত তারাই সঠিক পথের লোক। -সূরা ৬ আল আনআম : আয়াত ৮২।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

অর্থ : পুরুষ বা নারী যে-ই মুমিন অবস্থায় আমলে সালেহ করবে, অবশ্যি আমরা তাকে দান করবো (এই পৃথিবীতে) এক সুন্দর জীবন। -সূরা ১৬ : ৯৭।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থ : জনপদের অধিবাসিরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি আসমান ও যমিনের প্রাচুর্যের দ্বার খুলে দিতাম। -সূরা ৭ : আয়াত ৯৬।

৯. ইসলামের অনুসারীদের পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তাদের তিনি এমন জান্নাতসমূহ দান করবেন, যেগুলোর নিচে ঝরণাধারাসমূহ বহমান থাকবে এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চির সবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্যে থাকবে সুন্দর আবাস। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে, এটাই বড় সাফল্য। -সূরা ৯ তাওবা : আয়াত ৭২।

• بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ • وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ •

অর্থ : কিয়ামতের দিন আল্লাহর কিতাব আমান্যকারীদের বলা হবে : আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহংকার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের দলভুক্ত হয়েছিলে। আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যারোপ করেছে, তুমি কিয়ামতের দিন দেখবে, তাদের চেহারা কালো। অহংকারীদের জন্যে কি দোযখে যথেষ্ট যায়গা নেই? যারা তাদের সফলতার জন্যে সতর্ক জীবন যাপন করেছে, সেদিন তাদেরকে আল্লাহ নাজাত দিবেন। তাদেরকে কোনো মন্দই স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। -সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৫৯-৬১।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ : তাদের আমলের বদলা হিসেবে তাদের জন্যে চোখ জুড়ানোর মতো যা কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা কোনো মানুষই জানে না। -সূরা ৩২ সাজদাহ : ১৭।

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ • الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ • وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ • وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ • جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ • سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ •

অর্থ : তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে সত্য বলে জানে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধ? বুঝের লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগিকার পূর্ণ করে এবং কখনো অংগিকার /চুক্তি/প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনা; যারা সেইসব সম্পর্ক অটুট অক্ষুণ রাখে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন,

তারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং (আখিরাতের) মন্দ হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। তাছাড়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে তারা সবর অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে, আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিরোধ করে। এদের জন্যেই রয়েছে শুভ পরিণতি। তাহলো চিরস্থায়ী জান্নাত। তাতে আরো প্রবেশ করবে তাদের পরিশুদ্ধ জীবন যাপনকারী পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি। সকল দরজা দিয়ে সেখানে ফেরেশতা তাদের কাছে ছুটে আসবে। বলবে: "আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ আপনারা সবর করেছিলেন। আপনাদের পরিণতির ঘর কতো চমৎকার।" -সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ১৯-২৪।

* * *

৩

মুক্তির পথ এক আল্লাহর ইবাদত ও খিলাফত

পৃথিবীতে এক আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করা এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বের (খিলাফতের) দায়িত্ব পালন করা ছাড়া মানুষের মুক্তির কোনো পথ নেই। সে জন্যে ইবাদত ও খিলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য পরিষ্কার থাকা জরুরি।

ইবাদত ও খিলাফত শব্দ দু'টি কুরআনের দুটি পরিভাষা। শব্দ দুটি কুরআন মজিদে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে একটি একটি করে দুটি বিষয় নিয়েই আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. ইবাদত-এর অর্থ

আরবি ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মৌলিক অর্থ তিনটি :

১. পূজা বা উপাসনা করা (worship)।
২. আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা এবং বাধ্যতা ও নতি স্বীকার করা (obediene, submission)।
৩. দাসত্ব ও গোলামি করা (slavery)।

এই তিনটির ভিত্তিতে ইবাদতের অর্থ আরো প্রশস্ত। আরো অনেক প্রাসংগিক ভাবধারা এর সাথে একীভূত। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত:

১. দোয়া, প্রার্থনা, ফরিয়াদ, আরাধনা, আবেদন নিবেদন ও মিনতি করা।
২. ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রকাশ করা।
৩. ভজন ও গুণকীর্তন করা; পবিত্রতা ও অনাবিলতা প্রকাশ করা।
৪. উচ্চতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতা প্রকাশ করা।
৫. মাথা নত করা, আত্মসমর্পন করা।
৬. নিঃশর্তভাবে আইন ও ফায়সালা মেনে নেয়া।
৭. বিনীতভাবে নত ও বশিভূত থাকা।
৮. বিনা প্রতিবাদে হুকুম তামিল করা।
৯. মানত করা, উৎসর্গ করা।
১০. ত্রাণকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা হিসেবে মান্য করা।

এই মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো প্রতিটি এককভাবেও ইবাদত এবং সবগুলো সামষ্টিকভাবেও ইবাদত। কেউ এই কাজগুলোর কোনো একটি করলেও সেটা ইবাদত এবং সবগুলো করলেও সেগুলো ইবাদত।

যে ব্যক্তি ইবাদত (عِبَادَت) করে, তাকে বলা হয় আব্‌দ (عَبْد)। আব্‌দ মানে- উপাসক, পূজারি, কীর্তনকারী, ইবাদতকারী, ভক্ত, ফরিয়াদী, প্রার্থনাকারী, নিবেদক, অনুগত, বাধ্যগত, দাস, সেবাদাস। আরবি ভাষায় আল্লাহর ইবাদতকারীকে বলা হয় 'আবদুল্লাহ'।

২. ইবাদত সকল সৃষ্টির সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক বিধান

সকল জীব এবং জৈব ও জড় সৃষ্টিই জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে তাদের স্রষ্টার আব্‌দ বা ইবাদতকারী। তারা সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে এবং তিনি যে পদ্ধতির ইবাদত তাদের স্বভাবজাত করে দিয়েছেন সে পদ্ধতিতেই তারা তাঁর ইবাদত করে। মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার দাস (আব্‌দ)। এ দুয়ের মধ্যে যারা আছে এবং যা কিছু আছে সবাই এবং সবকিছু তাঁর দাস (আব্‌দ)। তাঁর ইবাদত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ তাদের নেই :

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

অর্থ : মূসা বললো : আমাদের রব তো তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেছেন অতপর (তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের) দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। -সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৫০।

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

অর্থ : অথচ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে যারা আছে, সকলেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৮৩।

৩. ব্যতিক্রম শুধু জিন আর মানুষ

উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু জিন আর মানুষ। শয়তান জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ জিন আর মানব জাতিকে ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will & choice) দিয়েছেন। সে কারণে শয়তান আল্লাহর হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করেছিল। এই স্বাধীনতার কারণেই মানুষও আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে :

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থ : আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। -সূরা ইসরা : আয়াত ২৭।

إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষ অতিমাত্রায় যালিম এবং অবাধ্য। -সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৪।

৪. মানুষ ও ইবাদত

মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে দুটি অবস্থা ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন :

১. প্রাকৃতিক বা জন্মগতভাবে মানুষ আল্লাহর দাস,
২. আল্লাহর দাস হবার ব্যাপারে সে স্বাধীন।
এ দুটি অবস্থার কারণ হলো, মানুষের মধ্যে আল্লাহ দুটি সত্তা সৃষ্টি করেছেন :

১. বস্তুগত সত্তা। অর্থাৎ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য বস্তুগত উপাদানসমূহ।
২. বুদ্ধিগত ও নৈতিক সত্তা। এর মধ্যে রয়েছে তারঃ intelligence, cognition. perception, sensation, ethics, judgment, feeling, will, choice, intention, desire, rationality, option, opinion, decisive power.

মানুষের বস্তুগত সত্তা জন্মগতভাবেই আল্লাহর দাস। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ স্রষ্টার একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাস। স্রষ্টা যে অঙ্গকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে যে ক্রিয়া/কর্ম (function) নির্দেশ করেছেন, সে বিনীতভাবে কেবল সে নির্দেশই পালন করে যাচ্ছে। মানুষের চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, রক্ত, মস্তিষ্ক ইত্যাদি প্রতিটি অরগ্যানই নিষ্ঠার সাথে স্রষ্টার হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। নিজের অরগ্যানসমূহের উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব (command) নেই। আপনি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেও আপনার চোখ দিয়ে শুনতে, কান দিয়ে দেখতে, পাকস্থলী দিয়ে চিন্তা করতে, মস্তিষ্ক দিয়ে খাদ্য হজম করতে, মুখ দিয়ে মূত্র ত্যাগ করতে, উপুড় হয়ে হাঁটতে, পা দিয়ে খেতে পারবেন না। কারণ, তারা আল্লাহর দাসত্ব করে, আপনার নয়।

কিন্তু পরম দয়াবান মহান আল্লাহ মানুষকে বস্তুগত সত্তার সাথে সাথে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাও দিয়েছেন এবং সে সত্তাটিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন ইচ্ছার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা (freedom of will & freeom of choice)।

ফলে একজন ব্যক্তি কার বাধ্যগত থাকবে, কার হুকুম বিধান পালন করবে, কার কাছে নত থাকবে, কার কাছে প্রার্থনা করবে, কার আনুগত্য করবে, কার দাসত্ব করবে? কার উপাসনা করবে? -এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কিন্তু তার এই প্রবণতাগুলো কাউকেও না কাউকেও অর্পণ করতেই হবে। অর্থাৎ কারো না কারো ইবাদত তাকে করতেই হবে। ইবাদত থেকে কোনো অবস্থাতেই সে মুক্ত থাকতে পারে না। কারণ ইবাদত করাই মানুষের প্রবণতাসমূহের স্রষ্টা প্রদত্ত প্রকৃতি।

৫. মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কার ইবাদত করে?

মানুষ আল্লাহ ছাড়া কার কার ইবাদত করে? এর জবাব হলো : যারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে এক আল্লাহর ইবাদত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানের ভিত্তিতে বা অজ্ঞানতার কারণে, সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে ইবাদত করে :

১. তাদের সার্থেরও আত্মার কামনা বাসনার,
২. শয়তানের,
৩. তাগুতের (ক্ষমতাবান কর্তৃত্বের), মহাপুরুষদের,
৪. পূর্ব পুরুষের, প্রথা ও ঐতিহ্যের এবং
৫. মূর্তির ও মনগড়া উপাস্যদের।

এ প্রসঙ্গে দেখুন মহান আল্লাহর বাণী :

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

অর্থ : ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার মত কী, যে তার হাওয়াকে (আত্মার কামনা বাসনাকে) নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তার উকিল হবে? -সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৪৩।

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا

অর্থ : (ইবরাহিম তার পিতাকে আরো বলেছিল :) বাবা! শয়তানের ইবাদত করবেন না, কারণ শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। -সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৪৪।

• أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থ : হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, কারণ সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। -সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৬০।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ : তাগুতের ইবাদত পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের জন্যে আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছি। -সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৩৬।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

অর্থ : তাদের যখন বলা হতো : 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো।' তখন তারা বলতো : 'না, বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে নিয়মের উপর পেয়েছি আমরা কেবল তারই অনুসরণ করবো।' -সূরা বাকারা : ১৭০।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

অর্থ : যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে : 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি এজন্যে, যাতে করে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়। -সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৩।

৬. মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশই তাকে দেয়া হয়েছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থ : হুকুম দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি হুকুম দিয়েছেন: তোমরা ইবাদত করোনা একমাত্র তাঁর ছাড়া। -সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৪০।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

অর্থ : পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে একমাত্র আল্লামুখী করে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। -সূরা ৯৮ বাইয়্যেনা : আয়াত ৫।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ...। -সূরা ০২ বাকারা : আয়াত ২১।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থ : তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই অংশীদার করো না। -সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৩৬।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ : কোনো উপাস্য নেই আমি ছাড়া। সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো। -সূরা ২১ আম্বিয়া : আয়াত ২৫।

أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

অর্থ : আমিই তোমাদের প্রভু। সুতরাং কেবল আমারই ইবাদত করো। -সূরা ২১ : আয়াত ৯২।

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অর্থ : আর তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম- সরল সঠিক পথ। -সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ৬১।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অর্থ : (ঈসা তার লোকদের বলেছিল :) নিশ্চয়ই আমার এবং তোমাদের প্রভু আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্ত াকিম। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫১।

যৌক্তিক দিক থেকেও আল্লাহর ইবাদত করাই মানুষের জন্যে সহজ সরল ও সঠিক। কারণ, মানুষের বস্তুগত সত্তা যেহেতু আল্লাহরই ইবাদত করে, তাই তার বুদ্ধিগত সত্তাও যদি আল্লাহরই ইবাদত করে, তবেই সমন্বয় (harmony) সৃষ্টি হতে পারে তার দেহ ও মনের মধ্যে। আর এ সমন্বয় সৃষ্টির দ্বারাই তার পক্ষে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। আর তার দেহ ও মনের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি না হলেই তার মধ্যে সৃষ্টি হবে অশান্তি। তার পরিণতি হবে অকল্যাণ আর ধ্বংস।

মানুষ যেনো নিজেকে অকল্যাণ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্যের পথ বেছে নেয়, সে জন্যেই freedom of choice দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমি জিন আর মানুষকে কেবল এজন্যেই সৃষ্টি করেছি, তারা যেনো (স্বেচ্ছায়) আমার ইবাদত করার পথই বেছে নেয়। -সূরা ৫১ যারিয়াত : আয়াত ৫৬।

৭. খিলাফত কী?

خلافة আরবি শব্দ। এর মূল خَلْف , আর خَلْف মানে- পেছনে আসা, পরে (next-এ) আসা, উত্তরাধিকারী হওয়া। خَلْف থেকেই গঠিত হয়েছে خلافة ও خَلِيْفَةٌ (খেলাফত ও খলিফা)। শব্দ দুটির মৌলিক অর্থ হলো :

১. পেছনে আগত, স্থলাভিষিক্ত।
২. একের পর এক আগত দল।
৩. প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

৪. উত্তরসূরী/পরবর্তী অনুসারী।
৫. প্রতিনিধি/দায়িত্বপ্রাপ্ত।
৬. শাসক/কর্তৃত্বশীল।

৮. খলিফার কাজ কী?

খলিফা বা প্রতিনিধির কাজ কী? খলিফা বা প্রতিনিধির কার্যাবলী (functions) সাধারণভাবে সকলেই জ্ঞাত ও অবহিত। মূলত খলিফার কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. মূল মালিকের বার্তা/আদেশ/নিষেধ/বিধান পৌঁছে দেয়া, জানিয়ে দেয়া এবং বুঝিয়ে দেয়া।
২. মূল মালিকের আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা এবং তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য আহ্বান করা।
৩. মূল মালিকের বিরুদ্ধাচরণ না করার আহ্বান করা।
৪. মূল মালিকের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সর্বপ্রকারে সতর্ক করা।
৫. মূল মালিকের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি বিধান করলে পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা।
৬. মূল মালিকের হুকুম-বিধান কার্যকর করা।
৭. মূল মালিকের ইচ্ছা ও আইন মোতাবেক শাসন পরিচালনা করা।

৯. আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষকে খলিফা বানিয়েছেন।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থ : স্মরণ করো, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন : আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে/নিযুক্ত করতে চাই। -সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩০।

প্রশ্ন হলো, এখানে 'খলিফা' মানে কি? এ আয়াতে উপরোক্ত ছয়টি অর্থের কোন্ অর্থটি গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে মুফাসসিরদের মধ্যে মত পার্থক্য হয়েছে। তবে নিম্নোক্ত দুটি মত অধিকতর যুক্তিসংগত ও অগ্রাধিকারযোগ্য :

১. এখানে 'খলিফা' শব্দটি সবগুলো অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এখানে 'খলিফা' শব্দটি প্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ শতকের সবচাইতে প্রাজ্ঞ তিনজন মুফাস্সির শহীদ সাইয়েদ কুতুব তাঁর তফসির ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তফসির তাফহীমুল কুরআন এবং মুফতি মুহাম্মদ শফি তাঁর তফসির মা'আরিফুল কুরআনে শেষোক্ত দুটি অর্থ অর্থাৎ প্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থই গ্রহণ করেছেন।

১০. মানুষ কার খলিফা?

কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করলে জানা যায়, মানুষ দায়িত্ব পালন করে-

১. আল্লাহর খলিফা হিসেবে, অথবা
২. শয়তানের খলিফা হিসেবে।

শয়তানের খলিফারা দাসত্ব, ইবাদত বন্দেগি ও তাবেদারি করে-
১. স্বয়ং শয়তানের,
২. নফসের (কামনা বাসনার),
৩. শয়তানি (অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ও দৃষ্কৃতকারী) নেতৃত্বের এবং
৪. রসম-রেওয়াজ, প্রথা প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের।

১১ আল্লাহর খলিফা হবার শর্ত

আল্লাহর খলিফা হবার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। এ তিনটি শর্ত পূরণ করা ছাড়া আল্লাহর খলিফা হওয়া যায় না। শর্ত তিনটি হলো :

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা,
২. আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদত) করা এবং
৩. ঈমান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক না করা।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

অর্থ : যারা ঈমান আনে গায়েব-এর প্রতি। -সূরা ০২ বাকারা : আয়াত ০৩।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থ : তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না। -সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৩৬।

১২. আল্লাহর খলিফার কাজ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এবং তাঁর বাধ্যতা ও দাসত্ব মেনে নিয়ে তাঁর খলিফা হয়, তাদের মূল কাজ হলো :

১. মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا

অর্থ : তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূর (আল কুরআন)-এর প্রতি। -সূরা ৬৪ আত তাগাবুন : আয়াত ৮।

২. মানব সমাজকে অন্যদের ইবাদত বর্জন করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা :

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ : তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। -সূরা ১৬ নহল : আয়াত ৩৬।

৩. আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক না করার আহ্বান জানানো :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থ : তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে কাউকেও শরিক করো না। -সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৩৬।

৪. আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার দাওয়াত দেয়া :

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ : মানুষকে তোমার প্রভুর পথে (চলার) দাওয়াত দাও হিকমত ও মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে। -সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ১২৫।

৫. ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থ : তোমরা শ্রেষ্ঠ মানবদল, মানবজাতির কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১১০।

৬. আল্লাহর দীন কায়েমের কাজ করা :

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অর্থ : তোমরা দীনকে (ইসলামকে) কায়েম করো, আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ো না। -সূরা ৪২ আশ শুরা, আতায়াংশ : ১৩।

৭. সত্য গ্রহণের উপদেশ দান এবং সত্যের উপর অটল থাকার নসিহত করা:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ : (তারা) একে অপরকে সত্য গ্রহণের উপদেশ দেয় এবং (সত্যের উপর) অটল থাকার উপদেশ দেয়। -সূরা ১০৩ আল আসর, আয়াতাংশ : ০৩।

৮. আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে শাসন কার্য ও বিচার ফায়সালা পরিচালনা করা :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

অর্থ : হে দাউদ! আমি তোমাকে ভু-খণ্ডে খলিফা বানিয়েছি। কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করো এবং হাওয়া (নফস) -এর অনুসরণ করো না। -সূরা ৩৮ ছোয়াদ : আয়াত ২৬।

৯. ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও মানব কল্যাণ করা :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

অর্থ : আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও মানব কল্যাণের আদেশ দিচ্ছেন। -সূরা ১৬ : ৯০।

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

অর্থ : মানুষের প্রতি ইহসান করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন। -সূরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতাংশ : ৭৭।

১০. দীনি আদর্শের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করা:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থ : এমনি করে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা সকল মানুষের উপর সাক্ষী (নমুনা) হও। -সূরা ০২ : আয়াত ১৪৩।

১৩. ইবাদত ও খিলাফত : সারকথা

মূলত ইবাদত হলো নিজে আল্লাহর দাসত্ব করা, আর খিলাফত হলো মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করা। সংক্ষেপে ইবাদত ও খিলাফত হলো :

ক্রম	ইবাদত	খিলাফত
১	নিজে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।	মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো।
২	নিজে আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার না করা।	আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার না করতে মানুষকে আহ্বান জানানো।
৩	নিজে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা।	মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানানো।
৪	নিজে আল্লাহর দাস হওয়া।	মানুষকে আল্লাহর দাস বানানো।
৫	নিজে আল্লাহর দাস থাকা।	মানুষকে আল্লাহর দাস রাখা।
৬	নিজে আল্লাহর পথে চলা।	মানুষকে আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানানো।

৭	নিজে ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ বর্জন করা।	মানুষকে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার আদেশ দেয়া।
৮	নিজে আল্লাহর দীন কায়েমের কাজ করা।	মানুষকে আল্লাহর দীন কায়েমের আহ্বান করা।
৯	নিজে দীনের জ্ঞানার্জন করা।	মানুষকে দীনের জ্ঞান দান করা।
১০	নিজে ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং সুবিচার করা।	মানুষকে ন্যায় পরায়ন হতে এবং সুবিচার করতে আহ্বান জানানো।
১১	নিজে মানব কল্যাণ করা।	মানুষকে মানব কল্যাণের আহ্বান জানানো।
১২	নিজে ন্যায় ও সত্যের উপর অটল থাকা।	মানুষকে ন্যায় ও সত্যের উপর অটল থাকার উপদেশ দেয়া।
১৩	নিজে জান্নাতের পথে চলা।	মানুষকে জান্নাতের পথে চলতে বলা।
১৪	নিজে জাহান্নামের পথ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।	মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর কাজ করা।
১৫	নিজে কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।	মানুষকে কুরআন সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানানো

ইবাদত ও খিলাফতের মর্মবাণী অতীব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে সূরা আল আসরে :

وَالْعَصْرِ • إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ •

অর্থ : সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা : ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে এবং পরস্পরকে উপদেশ-পরামর্শ দেয় সত্যকে আঁকড়ে ধরতে এবং ধৈর্যধারণ করতে।"

এখানে ক্ষতি থেকে বাঁচার শর্ত হিসেবে ইবাদত ও খিলাফতের কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

* * *

৪

ঈমান

১. ঈমানের পরিচয়

ঈমান মানে : আল্লাহকে এক বলে জানা, মানা, ঘোষণা করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুম মতো জীবন যাপন করা। কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়ে ঈমান আনতে হয়। 'কালেমা তাইয়্যেবা' মানে- 'উত্তম ও পবিত্র বাক্য'। ইসলামের পবিত্র বাক্য বা মূল কথা হলো :

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই।'

কালেমার ঘোষণা দিয়েই ঈমান আনতে হয়। ঘোষণা দিতে হয় এভাবে :

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللهِ

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্‌র রসূল।'

এই ঘোষণার মূল কথা হলো, আল্লাহকে ইলাহ মেনে নেয়া এবং মুহাম্মদ সা. কে তাঁর রসূল মেনে নেয়া। 'ইলাহ' মানে- উপাস্য, হুকুমকর্তা, ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, দোয়া শ্রবণকারী, সাহায্যকারী এবং আইন ও বিধানদাতা।

এই ঘোষণা দেয়াকে বলা হয় 'শাহাদাহ'। 'শাহাদাহ' মানে- সাক্ষ্য দেয়া বা সত্য বলে ঘোষণা করা। সে জন্যে এই বাক্যটিকে বলা হয় 'কালেমা শাহাদাহ' (word of witness)।

এই কালেমা বা পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করে যে ঘোষণা ও সাক্ষ্য দেয়া হয়, তার মূল কথা হলো :

আমি জেনে বুঝে স্বীকার করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে : আল্লাহ্‌ই আমার একমাত্র উপাস্য, হুকুমদাতা ও ত্রাণকর্তা। একমাত্র তিনিই আমার মুক্তিদাতা। শুধু তিনিই আমার প্রার্থনা শ্রবণকারী। কেবল তিনিই আমার সাহায্যকারী। আমি সারা জীবন কেবল তাঁরই হুকুম পালন করবো এবং কেবল তাঁরই দাসত্ব করে চলবো। আমি কখনো আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকেও ইলাহ্‌ মানবোনা। আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকেও ইলাহ স্বীকার করবোনা। আর কাউকেও হুকুমদাতা ও ত্রাণকর্তা মানবোনা। আর কাউকেও মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী এবং প্রার্থনা শ্রবণকারী মানবোনা। আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান মানবোনা।

২. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার মর্ম

আমাদের মাথার উপর বিশাল সূর্য। মহাবিশ্বে রয়েছে এই সূর্যের চাইতে বড় ছোট কোটি কোটি নক্ষত্র। রয়েছে গ্রহরাজি। আমাদের এই পৃথিবীও একটি গ্রহ। এছাড়া রয়েছে অনেক উপগ্রহ। আমাদের রাতের আকাশে ভেসে উঠে মিষ্টি হাসির চাঁদ। এই চাঁদ একটি উপগ্রহ।

কে সৃষ্টি করেছেন এদের সবাইকে? হ্যাঁ, এদের সবার যিনি স্রষ্টা, তিনিই আল্লাহ। তিনিই এদের সঠিক নিয়মে এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত করেন।

কে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে?

কে সৃষ্টি করেছেন পশু পাখি আর সব প্রাণীকে? মাটি থেকে গাছ গাছালি, ফল ফসল কে উৎপন্ন করেন? কে দিয়েছেন ফুলের ফলের বিচিত্র রঙ, স্বাদ?

কে সৃষ্টি করেন বীজ থেকে গাছ? এসবের যিনি স্রষ্টা, তিনিই আল্লাহ।

কে দিয়েছেন আমাদের :

- দেখার জন্যে চোখ?
- শুনার জন্যে কান?
- কথা বলা আর স্বাদ গ্রহণের জন্যে জিহ্বা?
- শ্বাস গ্রহণের জন্যে নাক?
- খাবার জন্যে দাঁত আর মুখ?
- ধরার জন্যে হাত?
- হাঁটার জন্যে পা?
- কে দিয়েছেন আমাদের হৃদয়?
- কে দিয়েছেন আমাদের মস্তিষ্ক?
- কে দিয়েছেন আমাদের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ?
- কে দিয়েছেন আমাদের শক্তি-সামর্থ্য?
- কে দিয়েছেন আমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি?
- আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে কে ব্যবস্থা করেছেন- আলো, বাতাস, পানির? ফল ফলারি, শস্যবীজ আর সব ধরণের খাদ্য সামগ্রীর?
- এসব কিছু যিনি আমাদের দিয়েছেন, তিনিই আল্লাহ। তিনি আমাদের মহান স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক, পরম দয়ালু রহমানুর রহিম।
- এই মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, গ্রহমালা, এই পৃথিবী, জীব-জানোয়ার আর সকল সৃষ্টি– কোনো কিছুই এমনি এমনি হয়ে যায়নি।

- এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টার ইচ্ছাতেই এসব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই সবকিছু সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। মানুষকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা মহান আল্লাহ।
- তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর হুকুম মতো জীবন-যাপন করার জন্য। তাঁর দাসত্ব করার জন্য।
- এই বিষয়গুলো জানা ও মানার নামই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের দুটি দিক রয়েছে :

এক : আল্লাহ্ আছেন বলে জানা ও মানা।

দুই : আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদ সম্পর্কে জানা ও মানা।

পয়লা বিষয়টি আমরা জানি ও মানি। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ আছেন বলে জানি।

আমরা আল্লাহকে সমগ্র জাহানের স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক বলে মানি।

৩. তাওহীদ কী?

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাওহীদ। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা ও মানার নামই হলো-তাওহীদ। চারটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক জানতে ও মানতে হবে। সেগুলো হলো

এক. আল্লাহর জাত বা সত্তার একত্ব

নিজ সত্তা বা অস্তিত্বকে 'জাত' বলা হয়। আল্লাহর জাত-এর একত্ব মানে এই বিষয়গুলো জানা ও বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহর তাঁর সত্তা ও অস্তিত্বের দিক থেকে-

- সম্পূর্ণ এক ও একক।
- তিনি অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য।
- তাঁর কোনো স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নেই।
- তাঁর পিতা-মাতা নেই।
- তাঁর কোনো আত্মীয় স্বজন নেই।
- তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।
- কারো সাথে তাঁর কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই।
- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।
- তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন।
- তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ-সর্বশক্তিমান।
- তিনি ছাড়া বাকি সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সৃষ্টিগতভাবে তাঁর দাস।
- সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অসহায়।

দুই. আল্লাহর গুণাবলীর একত্ব

আল্লাহর গুণাবলী ও সিফাতসমূহ এককভাবে আল্লাহর। তাঁর গুণাবলীতে কেউ তার অংশীদার নেই। তবে তিনি যে মানুষকে তাঁর গুণাবলীর কিছু অংশ দিয়ে গুণান্বিত করেন, তার দ্বারা মানুষ ঐসব গুণের মালিক হয় না, অধিকারী হয়।

আল্লাহর নিরানব্বইটি বা তার চাইতে বেশি সিফাত বা গুণাবলী রয়েছে। এই সব গুণাবলীর তিনিই একমাত্র মালিক বলে বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- একমাত্র :

- তিনিই স্রষ্টা।
- তিনিই জীবনদাতা।
- তিনিই মৃত্যুদাতা।
- তিনিই সব দৃশ্য-অদৃশ্য জানেন।
- তিনিই পরম দয়ালু।
- তিনিই পবিত্র।
- তিনিই নিখিল বিশ্বের সম্রাট।
- তিনিই শান্তিদাতা।
- তিনিই আশ্রয়দাতা।
- তিনিই পরাক্রমশালী।
- তিনিই ক্ষমতাধর।
- তিনিই শ্রেষ্ঠ।
- তিনিই জীবিকাদাতা।

এগুলো এবং এ রকম আরো অনেক গুণাবলী আল্লাহর রয়েছে। এসব গুণাবলীর একক মালিক তিনি। তিনি দয়া করে তাঁর কোনো কোনো গুণের কিছু অংশ কাউকেও দান করলে সে সেটুকুর অধিকারী হয়, মালিক হয় না। যেমন- মানুষের দয়া, শক্তি, সামর্থ, সাহস, বুদ্ধি, জ্ঞান, অর্থ, বিত্ত, সন্তান, সন্তুতি ইত্যাদি সবই আল্লাহর দান।

তিন. আল্লাহর ক্ষমতার একত্ব

তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলোঃ আল্লাহর ক্ষমতার একত্ব। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতার উৎস ও মালিক আল্লাহ।

- তিনি সর্বশক্তিমান।
- তিনি সকলের উপর ক্ষমতাধর।
- তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।
- তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই এবং সবকিছু সম্পূর্ণ অসহায়।

- তিনিই ক্ষমতা দেন এবং ক্ষমতা কেড়ে নেন।
- সকল ক্ষমতা এককভাবে তাঁর। তাঁর ক্ষমতায় কারো কোনো অংশ নেই।

চার. আল্লাহর অধিকারের একত্ব

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন এবং বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি তাকে দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন।

তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে মানুষের কর্তব্য বানিয়ে দিয়েছেন। এটা মানুষের উপর তাঁর অধিকার।

মানুষের উপর আল্লাহর কয়েকটি অধিকার হলোঃ

- মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য, ইবাদত বন্দেগি ও দাসত্ব করবে। কেবল তাঁরই প্রতি নত ও বিনয়ী থাকবে। তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করবে না।
- শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুম মতো জীবন যাপন করবে।
- শুধুমাত্র আল্লাহকেই সাজদা করবে।
- শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।
- শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলবে।
- শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে।
- আল্লাহকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের জন্যে কাজ করবে।

এগুলো মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার। এসব অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও প্রদান না করা এবং একমাত্র আল্লাহকে প্রদান করাই হলো আল্লাহর অধিকারের একত্ব।

৪. শিরক কী?

শিরক মানে- কাউকেও আল্লাহর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা আত্মীয় মনে করা। কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার বলে মনে করা। কাউকেও আল্লাহর সমান মর্যাদা দেয়া।

শিরকের পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ এবং যুক্তি নেই। শিরক মানুষের কল্পনা প্রসূত মনগড়া এক ভিত্তিহীন মতবাদ।

৫. তাওহীদ ও শিরক

শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত। তাওহীদ হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা ও মানা। অপরদিকে শিরক হলো সর্বক্ষেত্রে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার আছে বলে মনে করা।

তাওহীদের মতো শিরকও চার প্রকার। সেগুলো হলো :

এক. আল্লাহর জাত-এর সাথে শিরক করা

এই শিরককে বলা হয় 'শিরক বিজ্‌জাত' বা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কারো অস্তিত্ব স্বীকার করা। যেমন:

- একাধিক ইলাহ্ আছে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহর স্ত্রী, বা পুত্র , বা কন্যা আছে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহর পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন আছে বলে মনে করা শিরক।
- কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা শিরক।
- আল্লাহকে কারো মুখাপেক্ষী মনে করা শিরক।
- আল্লাহর সৃষ্টি ও সাম্রাজ্যে কেউ তাঁর অংশীদার আছে বলে মনে করা শিরক।
- কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সাথে আল্লাহর বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করা শিরক।

দুই. আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করা

আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর মালিক এককভাবে আল্লাহ নিজেই। অন্য কাউকে তাঁর কোনো সিফাতের মালিক মনে করা শিরক। যেমন-

- বিশ্বজাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনায় কাউকেও আল্লাহর সংগি-সাথি ও সাহায্যকারী মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া কাউকেও জীবনদাতা মৃত্যুদাতা মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রিযিকদাতা মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদদূরকারী মনে করা শিরক।
- আল্লাহ কারো সুপারিশ অবশ্যি গ্রহণ করেন বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহ কারো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি বান্দার প্রার্থনা শুনেন না কিংবা গ্রহণ করেননা বলে মনে করা শিরক।

তিন. আল্লাহর ক্ষমতায় শিরক করা

সমস্ত ক্ষমতার মালিক ও উৎস আল্লাহ তায়ালা। এ ক্ষেত্রে-

- আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ক্ষমতার উৎস মনে করা শিরক।
- কেউ আল্লাহর ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহর ক্ষমতায় কেউ অংশীদার আছে বলে মনে করা শিরক।
- আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর কেউ জয়ী হতে পারে বলে মনে করা শিরক।

চার. আল্লাহর অধিকারে শিরক করা

মানুষের উপর আল্লাহর যেসব অধিকার আছে, সেগুলো বা তার কোনোটি অন্য কাউকেও প্রদান করা শিরক। যেমন-

- আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত-বন্দেগি করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা-উপাসনা করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা বা দু'আ করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা শিরক।
- কবরে, মাজারে সাজদা করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় পোষণ করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর নিশ্চিন্ত ভরসা করা শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে বিনয় ও ভক্তিতে নত হওয়া শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারো ধ্যান করা শিরক।

৬. শিরক করা মহাপাপ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : শিরক আল্লাহর প্রতি এক বিরাট যুলম'। -সূরা ৩১ লোকমান : আয়াত ১৩।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থ : 'আল্লাহর প্রতি শিরক করার পাপ আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। তবে অন্য যে কোনো পাপ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন।' -সূরা ৪, আ. : ৪৮।

৭. মুশরিক কে?

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও কোনো না কোনো দিক থেকে বিশ্বাসে ও কর্মে আল্লাহর সাথে শিরক করে, তারাই মুশরিক। মুশরিকরা চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর অংশীদার বানায়, কিয়ামতের দিন তারাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে। যারা শিরক করে, তাদের পক্ষে কেউ সুপারিশ করবে না।

শিরক মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই প্রকৃত ঈমান।

৮. আখিরাতের প্রতি ঈমান

আখিরাত মানে- মৃত্যুর পরের জীবন।

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা মানে, এই কথাগুলো বিশ্বাস করা যে :

১. মৃত্যুর পর সব মানুষের আত্মা 'আলমে বরযখ' বা একটি অন্তরালের জগতে রাখা হবে। পরিভাষা হিসেবে এ জগতকেই কবর বলা হয়।

২. একদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন আল্লাহর হুকুমে ইসরাফিল ফেরেশতা সিংগায় ফুঁ দেবেন। তখন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সূর্য চাঁদ সবকিছু।

৩. ফেরেশতা দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁ দেবেন। তখন আল্লাহ্ সব মানুষকে আবার সশরীরে জীবিত করবেন। সবাই দৌড়ে এসে সমবেত হবে হিসাব দেয়ার জন্যে। এই সমবেত হওয়াকে বলা হয় 'হাশর'।

৪. তখন আল্লাহ্ পাক সব মানুষের বিচার করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালা কিতাব ও নবী পাঠিয়ে মানুষকে জীবন যাপন করার যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তারা সে পথে চলেছিল কিনা, সেই বিচার করবেন।

৫. যারা আল্লাহর দেয়া এবং রসূলের দেখানো পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করেছিল বলে প্রমাণিত হবে, বিচারে তারা সফলতা অর্জন করবে।

৬. বিচারে যারা সফলতা অর্জন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে মহাসুখ ও আনন্দের জান্নাতে থাকতে দেবেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই পাবে।

৭. যারা আল্লাহর দেয়া এবং রসূলের দেখানো পদ্ধতিতে জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, বিচারে তারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত।

৮. বিচারে যারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে দুঃখ, কষ্ট আর কঠিন শাস্তির জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে তারা চিরকাল ভোগ করবে আযাব আর আযাব।

এই কথাগুলো জানা, মানা এবং আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্যে সারাজীবন চেষ্টা করে যাওয়ার নামই হলো- 'আখিরাতের প্রতি ঈমান'। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। আখিরাতের প্রতি ঈমান না এনে কেউ মুমিন এবং মুসলিম হতে পারে না।

৯. রিসালাতের প্রতি ঈমান

'রিসালাত' মানে- মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পাঠানো ও পৌঁছানোর পদ্ধতি। মানুষের জন্যে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন-যাপনের পথ কোন্‌টি, কোন্ পথে

চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করবে- তা জানিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব।

এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা সর্বকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে নবী ও রসূল নিযুক্ত করেছেন। 'নবী' মানে- সংবাদ বাহক। 'রসূল' মানে বাণী বাহক বা বার্তা বাহক।

নবী-রসূলগণ মানুষ ছিলেন। আল্লাহই মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌছে দেয়ার জন্যে তাঁদের নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের কারো কাছে আল্লাহ পাক শুধু সঠিক পথের সংবাদ পাঠিয়েছেন। আবার কারো কারো কাছে সেই সাথে কিতাবও পাঠিয়েছেন।

নবী-রসূলগণ মানুষকে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন-যাপনের পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করতে বলেছেন। আল্লাহ পাক যা যা নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

মুহাম্মদ সা. পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পরে আল্লাহ পৃথিবীতে আর কোনো নবী ও রসূল পাঠাবেন না। আল্লাহ তাঁর প্রতি মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন।

মুহাম্মদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে সকল মানুষের জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় নবী। কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় আল্লাহর কিতাব। সুতরাং আল কুরআন এবং মুহাম্মদ সা.-এর অনুসরণই মুক্তির একমাত্র পথ।

- এই কথাগুলো জেনে ও মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই- রিসালাতের প্রতি ঈমান।

১০. কিতাবের প্রতি ঈমান

কিতাব হলো আল্লাহর বাণী। মানুষের জন্যে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন-যাপনের পথ কোন্‌টি- তা জানিয়ে দেবার জন্যে তিনি বিভিন্ন নবীর কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা অতীতে নূহ, ইদরিস, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ যাকারিয়া ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।

অতীতের এই নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর কিতাবসমূহ বিলীন কিংবা বিকৃত হয়ে গেছে। সেই সব কিতাব এখন আর অনুসরণীয় নয়।

মানুষের জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব 'আল কুরআন'। এই কিতাব তিনি তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি নাযিল করেছেন।

আল্লাহ পাক নিজেই কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবকে অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। আল কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে।

এই কিতাব নাযিল হবার পর থেকে এটিকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নেয়া এবং এর ভিত্তিতে জীবন যাপন করা ছাড়া পরকালে সফলতা অর্জন করা যাবে না। এই কিতাবই হিদায়াত ও মুক্তি লাভের একমাত্র পথ।

- এ কথাগুলো জেনে ও মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলার বা জীবন যাপন করার নামই- কিতাবের প্রতি ঈমান।

১১. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর মালিক ও সম্রাট। এই বিশ্ব-সাম্রাজ্য পরিচালনায় ফেরেশতারা আল্লাহ হুকুম অনুযায়ী কাজ করে। ফেরেশতারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। ফেরেশতারা মানুষের মতো নারীও নয়, পুরুষও নয়। তারা আল্লাহর একটি আলাদা সৃষ্টি। তাদের নিজস্ব কোনো কামনা বাসনা নেই। আল্লাহর হুকুম পালন করাই তাদের একমাত্র কাজ।

চারজন ফেরেশতার নাম আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন। তারা হলেন- জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল।

জিবরাইল নবীগণের কাছে অহী নিয়ে আসতেন।

- এই বিষয়গুলো জানা ও মানার নামই হলো- ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।

১২. তকদীরের প্রতি ঈমান

- তকদীর মানে- নির্ধারিত বিষয়।
- মানুষের জীবনে আল্লাহ তায়ালা কতগুলো জিনিস নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন, একজন মানুষ-
- কোন্ বাপের সন্তান হবে?
- কোন্ মায়ের গর্ভে জন্ম নেবে?
- কোন্ দেশে জন্ম নেবে?
- কোন্ বংশে জন্ম নেবে?
- তার গায়ের রং কী হবে?
- তার আকার-আকৃতি কী হবে?

- তার রক্তের গ্রুপ কী হবে?
- কখন কোথায় তার মৃত্যু হবে?
- সে বড় হয়ে কী ভূমিকা ও অবদান রাখবে?

এসব কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত (তকদীর)। এগুলো পরিবর্তন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এছাড়া পৃথিবীতে এবং মানুষের জীবনে ভালো মন্দ যা কিছু ঘটে, সেগুলো মানুষের কর্মফল অনুযায়ী আল্লাহর হুকুমেই ঘটে থাকে।

- এই বিষয়গুলো জানা ও মানার নামই হলো- তকদীরের প্রতি ঈমান।

১৩. ঈমান ও মুমিন

যে বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে, এতোক্ষণ আমরা সেই সব বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা জানতে পারলাম, আমাদের ঈমান আনতে হবে:

- আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর একত্বের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, রিসালাতের প্রতি, কিতাবের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি এবং তকদীরের প্রতি।
- ঈমানের তিনটি দিক রয়েছে। অর্থাৎ জানা, মানা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে জানতে হবে, মেনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা নিয়ে যিনি ঈমান আনেন এবং ঈমানের পথে চলেন তিনিই মুমিন।

* * *

৫

ইসলাম

১. ইসলাম কী?

'ইসলাম' আরবি শব্দ। 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ- হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা, নত ও বাধ্যগত থাকা এবং আত্মসমর্পণ করা।

ইসলাম আল্লাহর দীন। বরং আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র 'দীন'।

'দীন' আরবি শব্দ। 'দীন' মানে- আনুগত্য, আনুগত্যের বিধান, জীবন যাপন করার নিয়ম কানুন, জীবন ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি। তাই,

- আল্লাহর হুকুম মতো জীবন-যাপন করার নাম- ইসলাম।
- আল্লাহর আনুগত্যের জীবন যাপনের নাম-ইসলাম
- আল্লাহকে একমাত্র মালিক, মনিব ও প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর কাছে নত ও বাধ্যগত থেকে জীবন যাপন করার নাম -ইসলাম
- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর ইচ্ছা ও বিধান মাফিক জীবন যাপন করার নাম -ইসলাম।

ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত জীবন-যাপন পদ্ধতি। ইসলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ। ইসলাম মানুষের সফলতা অর্জনের পথ। ইসলাম ছাড়া বাকি সব মত ও পথ ভুল এবং মানুষের জন্যে অকল্যাণকর। ঈমান আনার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। ঈমান হলো বীজ আর ইসলাম হলো গাছ। ঈমান হলো ভিত্তি আর ইসলাম হলো তার উপর নির্মিত অট্টালিকা।

যে মহান স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই অত্যন্ত মেহেরবানী করে মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সে পথই হলো ইসলাম। এ জন্যে তিনি কিতাব নাযিল করেছেন, রসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবে বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : 'আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।' -সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯।

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ

অর্থ : '(হে নবী) বলে দাও : আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত বা জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৭৩।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। -সূরা ৫ আল-মায়িদা : আয়াত ৩।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থ : যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীনের অনুবর্তন করতে চায়, তাদের সে দীন বিন্দুমাত্র কবুল করা হবে না। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৮৫।

রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদিসে ইসলামের পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিজের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিতে গিয়ে সাহাবি মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা আল কুশাইরী রা. বলেন : আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমাদের প্রভু কী জিনিস নিয়ে আপনাকে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন : দীন ইসলাম নিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : দীন ইসলাম কী? তিনি বললেন : ইসলাম হলো এই যে, তুমি ঘোষণা করবে : আমার পূর্ণাঙ্গ সত্তা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিলাম। তারপর অন্য সকল ইলাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবলমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবে। সালাত কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে।" -আল ইস্তিয়াব।

মূলত ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের বিধান। আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত অন্য সকল প্রকার আনুগত্য পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে থাকাই ইসলামের দাবি।

আর ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান। সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ নামক এক সাহাবি রা. বলেন :

'আমি অনুরোধ করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পর আর কাউকেও জিজ্ঞেস করতে হবে না। তিনি বললেন, বলো : আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতপর একথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো।' -সহীহ মুসলিম।

মূলত এক আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো দীন ইসলামের গোড়ার কথা। এই ঈমান বিল্লাহকে কেন্দ্র করে গোটা দীন ইসলাম আবর্তিত হয়। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে- তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তা মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনকে সেই ঈমান ও ধ্যান-ধারণার ছাঁচে ঢেলে গড়ে তোলা। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের গোড়ার কথা।

ঈমানের তিনটি মৌলিক কথা হলো, আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ সা.-কে রসূল হিসেবে মেনে নিতে হবে। রসূল সা. বলেন :

• ذَاقَ طَعَمَ الاِيْمَانَ مَنْ رَضِىَ بِا اللهِ رَبًّا وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً •

অর্থ: 'ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তিই আস্বাদন করতে পেরেছে, যে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদকে সা. রসূল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।' -সহীহ মুসলিম।

আরবি ভাষায় 'রব' শব্দের তিনটি অর্থ :

১. মালিক, প্রভু ও মনিব ২. অভিভাবক, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষণকারী ৩. আইনদাতা, শাসক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। এই সকল দিক থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

আগেই বলেছি দীন মানে- আনুগত্য, আনুগত্যের নিয়ম-বিধান, আইন এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো: ইসলামকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্যের বিধান, তাঁর আইন-কানুন এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়াই দীন ইসলামের দাবি।

মুহাম্মদ সা. কে রসূল মেনে নেয়ার অর্থ হলো : তাঁকে আল্লাহ তায়ালার আইন ও বিধান, তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করার পন্থা, মানুষ হিসেবে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-নীতি এবং সর্বোপরি তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি জানার একমাত্র মানদণ্ড ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মেনে নিতে হবে যে, তাঁর জীবনই কুরআন ও ইসলামের একমাত্র ব্যাখ্যা। তাঁর পুর্ণাঙ্গ অনুসরণই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে তাঁর নীতি পরিহার করা মানেই ইসলামকে পরিহার করা।

ইসলামের কতগুলো মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে। এ সম্পর্কে একটি হাদিস হলো : উমর ইবন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আগন্তুক (জিবরাইল) বললেন : হে মুহাম্মদ সা., আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন (ইসলাম কি?) তিনি বললেন : ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল। সালাত কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং পথ পাড়ি দেয়ার সামর্থ থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে।" -সহীহ মুসলিম।

আল্লাহকে ইলাহ্ এবং মুহাম্মদ সা.-কে রসূল মেনে নিলে আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল প্রদর্শিত সমস্ত বিধি-বিধান এবং যাবতীয় পথ ও পন্থা মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই হাদিসে কয়েকটি বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে ভাষণ দিতে গিয়ে সাহাবি জাফর বিন আবু তালিব রা. ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে:

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বলেন, (বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে) জাফর ইবনে আবু তালিব তাঁর ভাষণে বলেন :

"হে সম্রাট! আমরা অজ্ঞতা, অন্ধতা ও জাহেলিয়াতের জীবন-যাপন করছিলাম। নিজেদের হাতে তৈরি করা মূর্তির পূজা করতাম। মৃত জন্তু খেতাম। অশ্লীলতা ও অপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অসদাচরণ করতাম। সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করতাম।

এই অবস্থায় আমরা জীবন যাপন করছিলাম। এমনি সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের জন্যে একজন রসূল পাঠালেন। আমরা তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং তাঁর পবিত্র জীবন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিফহাল। তিনি এসে আমাদের আহ্বান করলেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করতে, কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও গোলামি করতে এবং আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটি ও পাথরের যেসব মূর্তি পূজা করতাম, সেগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন- সত্য কথা বলতে, আমানতের খিয়ানত না করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করতে এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে।

তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন- অশ্লীল কাজ করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, এতীমদের সম্পদ গ্রাস করতে এবং পূত চরিত্রের মহিলাদের অপবাদ দিতে।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন- কেবলমাত্র আল্লাহর আইন মানতে, তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে।" -মুসনাদে আহমদ।

২. ইসলাম মানব কল্যাণের জীবন বিধান

ইসলাম হলো মানব ধর্ম। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্যেই এর আবির্ভাব। এ প্রসঙ্গে সাহাবিদের প্রশ্নের জবাবে রসূল সা. যে কথাটি বলেছিলেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন : হে রসূলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তির ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির ইসলাম সর্বোত্তম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। -সহীহ বুখারি।

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে) বলেন : আমি নবী করীম সা. এর নিকট এসে বললাম : আমি আপনার কাছে ইসলামের ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই। তখন তিনি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার শর্তারোপ করেন। আমি সেই শর্তেই বাইয়াত করলাম। -সহীহ বুখারি।

ইসলাম যে মানব কল্যাণের দীন, তার আরেকটি প্রমাণ হলো, নিম্নোক্ত হাদিসটি।

সাহাবি তামিম দারি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের বললেন : 'দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা ।' তিনবার বললেন এ কথা তিনি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : কার জন্য? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে। মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্যে এবং তাদের সমস্ত জনগণের জন্যে। -সহীহ মুসলিম।

এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর জন্যে কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করবে। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতার স্থান দেবে না।

এ নিষ্ঠা ও অকৃত্রিমতার দাবি হলো, আল্লাহর জাত, সিফাত, ক্ষমতা ও অধিকার প্রভৃতি কোনো একটি দিক দিয়ে বান্দাহ আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করবে না। আর এতে মানুষ মূলত নিজেরই কল্যাণ করবে।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, মানুষ-

১. কুরআন পড়বে, বুঝবে।
২. কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করবে।
৩. কুরআনের হুকুম আহকাম মেনে চলবে এবং কার্যকর করবে।

রসূলের জন্যে কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে : তাঁর আদর্শকে নিজ ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও তরতাজা করা। তাঁর আদর্শকে সমাজে বিজয়ী করা এবং তার নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মুসলমান নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছেঃ তারা সঠিক কাজ করলে তাদের সহযোগিতা করা। অন্যায় করলে তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা, সমালোচনা করা। এ জন্যে নির্যাতনও ভোগ করতে হতে পারে।

সাধারণ জনগণের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে :

১. কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা এবং তাদের সত্যানুভূতি জাগ্রত করে তোলা।
২. তারা দীন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তাদের নিকট দীনের যথার্থ জ্ঞান প্রচার করা এবং ঘরে ঘরে দীনের আলো পৌঁছে দেয়া।
৩. তারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এমন ব্যবস্থা করা যেনো কেউ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।
৪. তাদের কেউ বিপদগ্রস্ত হলে কিংবা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাকে সাহায্য করা।
৫. কোনো মুসলমান ইন্তেকাল করলে তার কাফন, দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

এটি একটি ছোট্ট হাদিস বটে; কিন্তু এতে মানবতার ধর্ম ইসলামের সারাংশ বলে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সা. নাজরানবাসীদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে ইসলামের সারকথা ও মূল আহ্বান পেশ করেন এভাবে :

'... অতপর আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা মানুষের দাসত্ব ও গোলামি পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব ও গোলামি) কবুল করো। মানুষের নেতৃত্ব ও শাসন পরিহার করে এক আল্লাহর শাসন ও কর্তৃত্বের অধীন হয়ে যাও।' -তাফসীরে ইবনে কাসীর।

মূল হাদিসে 'ইবাদত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই আরবি 'ইবাদত' শব্দটি উপাসনা, বন্দেগি, আনুগত্য এবং দাসত্ব ও গোলামি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইসলামের আহ্বান হচ্ছে: হে মানুষ! তোমরা মানুষের পূজা, উপাসনা ও বন্দেগি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপাসনা ও বন্দেগি করো। তোমরা মানুষের আনুগত্য ও অনুবর্তন পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করো। তোমরা মানুষের দাসত্ব ও গোলামি থেকে স্বাধীন হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার গোলামি ও অধীনতা স্বীকার করে নাও।

ইসলামের আহ্বান হচ্ছে : হে মানুষ! তোমরা মানুষের সর্বভৌম ক্ষমতা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও শাসন অস্বীকার ও পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র সম্রাট আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও শাসনের অধীন হয়ে যাও।

এটাই হচ্ছে মানুষের কাছে ইসলামের শাশ্বত দাবি ও আহ্বান।

এ যাবত কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামের যে পরিচয় পেশ করা হলো, তার সারকথা হলো :

১. ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত দীন।

২. দীন ইসলাম মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন বা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইসলামের মূলকথা হলোঃ ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান। ঈমান বিল্লাহকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ।

৪. প্রত্যেক মুমিনের নিকট ইসলামের দাবি হলো, আল্লাহ তায়ালাকে 'রব' তথা-মালিক, প্রভু মনিব, অভিভাবক, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষণকারী, আইন ও বিধানদাতা, শাসক, পরিচালক ও কর্তৃত্বশীল মেনে নিতে হবে।

৫. ইসলামকে আল্লাহ তায়ালার দীন তথা তাঁর আইন, আনুগত্যের বিধান এবং তাঁর প্রদত্ত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬. মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ তায়ালার রসূল তথা প্রতিনিধি মেনে নিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। তাঁকে ইসলামি আদর্শের একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৭. ইসলামের কয়েকটি বড় বড় বিধান হচ্ছেঃ নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের রোযা রাখা, পথ পাড়ি দেবার সামর্থ থাকলে হজ্ব করা।

৮. ইসলাম এক মুসলিমের জন্যে অপর মুসলিমের নিকট কল্যাণ ও নিরাপত্তা দাবি করে।

৯. ইসলাম মূলত সকলের কল্যাণ কামনার দীন।

১০. ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার গোলাম বানাতে চায়।

১১. ইসলাম মানব সমাজে আল্লাহর আইন, বিধান ও কর্তৃত্বের পূর্ণাঙ্গ দাবি করে। সুতরাং ইসলাম চায়–

১২. এই পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে এমন পরিপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে মানুষের কর্তৃত্ব এবং মনগড়া মতবাদসমূহ সম্পূর্ণ নির্মূল-নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দীন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। মানুষ মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হবে এবং একমাত্র আল্লাহর গোলাম হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৩. মুসলিম কে?

মুসলিম কে?- উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের জবাব এখন সহজ হয়ে গেলো। আমরা সহজেই বলতে পারি :

যে ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করে, সেই মুসলিম। মুসলিম মানে

- আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনকারী।
- আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবন-যাপনকারী
- আল্লাহর হুকুম ও বিধান মতো জীবন পরিচালনাকারী।
- আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপনকারী।
- মুহাম্মদ রসূল সা. -এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে জীবন যাপনকারী।
- আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর অনুসরণকারী।
- আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল কিছু পরিহারকারী।

৪. কুফর ও কাফির

কুফর হলো আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালকে অস্বীকার করা কুফর। আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে মনগড়া বা মানুষের তৈরি করা পদ্ধতিতে জীবন যাপন করা 'কুফর'। যে ব্যক্তি ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর হুকুম ও বিধান অমান্য করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে, সে-ই কাফির। কুফর হলো ঈমানের বিপরীত। ঈমান হলো আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা, কুফর হলো আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি।

৫. কে মুসলিম, কে কাফির?

আমরা জেনেছি, ইসলাম আমাদের দীন। ইসলাম আমাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপনের নামই 'ইসলাম'।

'মুসলিম' মানে- আল্লাহর হুকুম পালনকারী।

সানজিদ আল্লাহর সঠিক পরিচয় জেনেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। সে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করে। সানজিদ একজন মুসলিম।

বরকত আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানে না এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে না। সে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করে না। বরকত একজন কাফির।

'কাফির' মানে- আল্লাহর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী। ইকরামা কাফিরের পুত্র। ইকরামা জানতে পারেন- আল্লাহ, তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করলেই মানুষ কল্যাণ লাভ করবে।

ইকরামা ঈমান আনেন এবং আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করেন। ইকরামা হন একজন খাঁটি মুসলিম। তিনি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন।

ইকরামার কাফির বাবা-মাই তার নাম রেখেছিল ইকরামা। কিন্তু তার বাবা আল্লাহর পথে আসেনি। আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করেনি। তার পিতা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হয়। তাই ইকরামার পিতা আবু জাহিল চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

পরজীবনে মুসলিমরা থাকবে জান্নাতে। সেখানে কেবল সুখ আর সুখ। আনন্দ আর আনন্দ। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই পাবে। চিরকাল তারা আনন্দ উপভোগ করবে।

আর কাফিরের পরকাল হবে দুঃখময়। সেখানে চিরকাল তারা ভোগ করবে শাস্তি আর শাস্তি। চিরকাল তারা জ্বলবে জাহান্নামের আগুনে। কেউ তাদের রক্ষা করবে না। এর কারণ স্রষ্টার প্রতি অস্বীকৃতি।

৬. মুনাফিক

সব মুসলিম সমাজেই মুসলিম নামধারী এক ধরনের কপট লোক থাকে। এদের বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিক মানে দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। এরা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা মুসলিম। কিন্তু চিন্তায় ও কর্মে তারা কাফির।

কুরআন এবং হাদিসে সেসব লোককে মুনাফিক বলা হয়েছে, যাদের মুখ কখনো থাকে কুফরের দিকে, আবার কখনো থাকে ইসলামের দিকে। কুরআন ও হাদিসে তাদের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এভাবে :

১. তারা মুখে বলে আমরা ঈমানদার, কিন্তু কাজ করে কাফিরদের মতো।
২. তারা ইসলামি লোকদের কাছে এলে বলে- আমরা আপনাদেরই লোক। কাফেরদের কাছে গিয়ে বলে: আমরা তো আসলে তোমাদেরই লোক।
৩. তারা পরিচয়ে মুসলিম এবং বিশ্বাসে ও কাজে কাফির।
৪. তাদের কথায় এবং কাজে মিল নেই।
৫. তারা মিথ্যা কথা বলে।
৬. তারা ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ে থাকে।
৭. তারা সুযোগ সন্ধানী।
৮. ইসলামি লোকদের উপর বিপদ এলে তারা খুশি হয়।
৯. ইসলামি লোকদের সফলতা দেখলে তাদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি হয়।
১০. তারা আমানতের খিয়ানত করে।

১১. তারা নামাযের কথা ভুলে থাকে।
১২. তারা নামাযে অলসতা দেখায়।
১৩. তারা ওয়াদা খেলাফ করে।
১৪. তারা ইসলামের প্রচার ও প্রবর্তনের কাজে শরিক হয় না এবং ইসলামের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করে না।
১৫. তারা সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধীতা করে।

আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে বলেছেন: 'মুনাফিকদের স্থান হবে দোযখের একেবারে গভীরতম স্থানে।' হ্যাঁ, তাদের শাস্তি হবে সবচাইতে কঠিন।

নবীর সময়ও মুনাফিক ছিলো। আজও মুসলিম সমাজে অনেক মুনাফিক আছে। মুনাফিকরা জান্নাতে যাবে না। জাহান্নামই হবে তাদের আবাস।

৭. ইসলামকে জানার উপায় কী?

আল্লাহর হুকুম মতো তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার নামই- ইসলাম। কিন্তু আল্লাহর হুকুম ও বিধান এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ জানার উপায় কি?

আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে বলেছেন। সে জন্যে তিনি যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সব জাতির কাছেই নবী রসূল পাঠিয়েছেন। নূহ, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া, ঈসা আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর নবী ও রসূল ছিলেন। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল।

আল্লাহ পাক রসূলদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন। আল্লাহর কিতাবে আল্লাহর হুকুম-বিধান ও তাঁর সন্তুষ্টির পথের কথা পরিষ্কার করে লেখা আছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সা. এর প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব।

সুতরাং ইসলামকে জানার উপায় হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন পড়া এবং মুহাম্মদ সা. এর সুন্নাহ বা হাদিস অধ্যয়ন করা।

ক. কুরআন

কুরআন আল্লাহর কিতাব। কুরআনের আগে আল্লাহ যতো কিতাব পাঠিয়েছেন, সেগুলো সবই নষ্ট কিংবা বিকৃত হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ ইসলামকে জানতে, বুঝতে ও মানতে হলে সবাইকে এখন কেবল কুরআন

পড়তে হবে। কুরআন বুঝতে হবে এবং কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে হবে।

বাংলায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির রয়েছে। তাই যারা পড়া-লেখা জানেন, তাঁরা পড়েই কুরআন বুঝতে পারেন। যারা লেখা-পড়া জানেন না, তারা জ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনে কুরআন বুঝবেন।

কুরআন বুঝা এবং মানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয।

খ. সুন্নাহ ও হাদিস

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল। আল্লাহ তাঁর কাছে কুরআন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসূল তাঁর সাথিদের কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন।

- তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
- আল্লাহর হুকুম মতো কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়, তা তিনি নিজে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন।
- মুহাম্মদ সা. আল্লাহর হুকুম ও বিধান মতো জীবন যাপন করার জন্যে যে শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং যে রীতি-পদ্ধতি চালু করেছেন, তাকেই বলা হয়- সুন্নাহ বা সুন্নতে রসূল।
- তাই, আল্লাহর বিধান মতো তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে হলে রসূলের সুন্নত অনুসরণ করতে হবে। রসূলের সুন্নাহ জানা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য।

রসূলের সুন্নাহ জানা যাবে হাদিস থেকে। হাদিসের মধ্যেই রয়েছে সুন্নাহ্‌। হাদিসও বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্বের ভাষণে পরিষ্কার করে বলে গেছেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, সে দুটোকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না, একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ। -মুসনাদে আহমদ।

* * *

৬

আল্লাহর কিতাব আল কুরআন

১. আল কুরআন কী?

আল কুরআন আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও সম্রাট মহান আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ও লাভ ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। সুতরাং এটি অকাট্যভাবে আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর বাণী। তাই-

- আল্লাহকে জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- মানুষ সৃষ্টির কারণ জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- আল্লাহর আদেশ নিষেধ জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- কিভাবে আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করতে হয়, তা জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ জীবন গড়ার উপায় জানতে কুরআন পড়ুন।
- দুনিয়ার কল্যান এবং পরকালের সাফল্যের পথ জানতে কুরআন পড়ুন।
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- পরম দয়াবান দাতা মহান আল্লাহর ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ুন।
- আল্লাহর সীমাহীন পুরস্কার এবং চির সুখ ও চির আনন্দের জান্নাত পাবার উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ুন।

২. আল কুরআনের আহ্বান

আল কুরআন আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আত্মা জিব্রীল ফেরেশতার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই

মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোনটা মানুষের কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্টা মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্টা মুক্তির। কোন্টি শাস্তির পথ আর কোন্টি পুরস্কারের? কোন্টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্টি তাঁর অসন্তুষ্টির পথ? কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

প্রতিটি বক্তব্যের সাথে সাথে কুরআন মানুষকে এই লক্ষ্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় সম্পর্কে নির্দেশিকা দিয়েছে এবং লক্ষ অর্জন করার পথে ধাবিত হতে বলেছে।

কুরআন মানুষের জন্যেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষের প্রতি কুরআনের মূল আহ্বান হলো: হে মানুষ! তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব করো, শুধু তাঁরই আনুগত্য করো এবং শুধুমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলো। কেবলমাত্র এতেই রয়েছে তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। এতেই রয়েছে তোমাদের শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য।

আল্লাহর দাসত্বের উপায় এবং তাঁর দাসত্বের মাধ্যমে কল্যাণ ও সাফল্য লাভের জন্যে কুরআন আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সে বিষয়গুলো দুই প্রকার :

ক. বিশ্বাসগত এবং খ. কর্মগত

মানুষের প্রতি কুরআনের বিশ্বাসগত আহ্বানগুলো হলো, হে মানুষ :

১. এই মহাবিশ্ব এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে রয়েছেন এক মহাবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা, এক মহা শক্তিধর স্রষ্টা, তিনিই আল্লাহ। তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর হুকুম মেনে চলো।
২. আল্লাহ এক! তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তিনি এক, একক। তিনি সর্বশক্তিমান, সকল ক্ষমতার উৎস। তোমরা তাঁকে এক ও একক বলে বিশ্বাস করো।

৩. মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাদের পুনরায় জীবিত করবেন। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আল্লাহ সেখানে মানুষের পার্থিব জীবনের বিশ্বাস ও কাজের হিসাব নেবেন, বিচার করবেন। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দাসত্ব করেছে, তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে তিনি চির সুখের জান্নাত দান করবেন। আর যারা আল্লার হুকুম অমান্য করেছে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। হে মানুষ! তোমরা মরণের পরের এই জীবন ও জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।
৪. আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার কল্যাণ ও সাফল্যের পথ জানাবার জন্যে মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ রসূল। তোমরা তাঁকে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নাও।
৫. আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জীবন যাপনের পথ নির্দেশ বা গাইড বুক হিসেবে মুহাম্মদ সা. এর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন। এ কিতাবকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নাও।
৬. মহাবিশ্ব পরিচালনার কাজে আল্লাহর কর্মচারী হলো ফেরেশতারা। আল্লাহর নির্দেশে তারা মানুষের সমস্ত কাজ কর্ম, কথাবার্তা এবং চিন্তা ও বিশ্বাস রেকর্ড করে। তাদেরকে বিশ্বাস করো।

এগুলো হলো মানুষের প্রতি কুরআনের বিশ্বাসগত আহ্বান। আর মানুষের প্রতি কুরআনের কর্মগত আহ্বান হলো, হে মানুষ :

১. তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো।

২. তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করো না। তাঁর হুকুমের বিপরীত কারো হুকুম পালন করো না।

৩. তোমরা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করো এবং আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করো। তাঁকে আদর্শ হিসেবে মেনে নাও। তিনি যা করতে বলেছেন তা করো এবং যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

৪. তোমরা কুরআনকে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নাও এবং এর পথ নির্দেশের ভিত্তিতে জীবনযাপন করো।

৫. ইবাদতের বিধান দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর জন্যে এসব ইবাদত করো। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করো, তাঁরই কাছে সাহায্য চাও, ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসো।

৬. সৎকর্ম, সৎ গুণাবলী ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এভাবে কাজ করো, এসব গুণাবলী অর্জন করো, এরকম চরিত্র গঠন করো এবং এরকম আচরণ করো।
৭. অসৎ কর্ম, অসৎ গুণাবলী ও মন্দ চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এগুলো পরিহার করো, বর্জন করো।
৮. কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।
৯. আল্লাহর আইন ও বিধান কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
১০. কপটতা পরিহার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।
১১. বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
১২. জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বিবরণ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।
১৩. জান্নাতের চির সুখ ও মহা আনন্দের আকর্ষণীয় বিবরণ প্রকাশ করে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

* * *

৭

কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা

অনেকেই অজ্ঞতা বশত মনে করেন, কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত ও সত্যের বিপরীত। কুরআন কোনো ধর্মগ্রন্থ্ নয় এবং শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। বরং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্যে আল কুরআন আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান। আল্লাহ্ তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি এ কিতাব নাযিল করেন। আর মুহাম্মদ সা. সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল। মহান আল্লাহ্ নিজেই বলেন :

১. '(হে মুহাম্মদ!) বলো : হে মানব জাতি! অবশ্য অবশ্যি আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই মহান আল্লাহর রসূল, যিনি মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর কর্তৃত্বের মালিক।' -সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৫৮।

২. 'সমগ্র মানব জাতিকে সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ক করার জন্যে আমি তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। তবে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ।' -সূরা ৩৪ আস সাবা : আয়াত ২৮।

মুহাম্মদ সা. যে বিশ্বের সকল মানুষের রসূল এ আয়াতগুলো থেকে সে কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। সুতরাং মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআনও যে গোটা বিশ্ব মানুষের জীবন-পদ্ধতি হিসেবেই নাযিল হয়েছে, সে কথাও সূর্যালোকের মতো পরিষ্কার। মহান আল্লাহ্ বলেন :

১. 'রমযান মাস, এ মাসেই অবতীর্ণ করা হয়েছে আল কুরআন সমগ্র মানব জাতির জীবন-ব্যবস্থা ও পথ-নির্দেশ হিসেবে এবং সঠিক জীবন-ব্যবস্থা ও পথ-নির্দেশিকার প্রমাণ ও মানদণ্ড হিসেবে।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।

২. 'এ কিতাব মানব জাতির জন্যে (সঠিক পথের) সুস্পষ্ট বিবৃতি (Plain statement for mankind) আর বিবেকবানদের জন্যে উপদেশ।' -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৮।

৩. আমার কাছে এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদেরকে এবং ঐ সমস্ত মানবমণ্ডলীকে সতর্ক করার জন্যে, যাদের কাছে তা পৌছুবে।' -সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৯।

একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, কুরআন শুধু মুমিনদের নয়, শুধু মুসলমানদের নয়, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল হয়েছে।

কুরআন লিখিতভাবে নাযিল হয়নি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে কুরআন লিখে যা ছেপে সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোও সম্ভব ছিলো না। কুরআন ছিলো তাঁর স্মৃতিপটে গাঁথা। তাই তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন 'সব মানুষকে' পাঠ করে শুনাতে :

'আর আমি তোমার প্রতি 'আয্-যিকর' (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যেনো তুমি 'মানুষকে' তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও- যা 'তাদের প্রতি' অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে করে তারা ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' -সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪।

এছাড়া সূরা আল-জুমু'আর দ্বিতীয় আয়াতে রসূল সা.-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, মানুষকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার। আরো বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছে।

হাদিস এবং সীরাতের গ্রন্থাবলীতে প্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. হাটে-বাজারে, রাস্তাঘাটে সমবেত মানুষকে এবং কাফির মুশরিকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। কুরআনের প্রভাব থেকে জাহেলি সমাজকে দূরে রাখার জন্যে কাফির নেতারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ হয়েছে :

'কাফিররা বলেঃ তোমরা এই কুরআন শুনো না। আর (তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে শুরু করলে) তোমরা হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দিও। তবেই হয়তো তোমরা জিতবে।' -সূরা ৪১ হামীম আস সাজদা : আয়াত ২৬।

এতোক্ষণ আমরা কুরআন থেকে যেসব আয়াত উল্লেখ করলাম, সেগুলো থেকে অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে বুঝা গেলো :

১. মুহাম্মদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত 'সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে' আল্লাহর রসূল।

২. মুহাম্মদ সা. -এর প্রতি অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআন 'সমগ্র বিশ্ববাসীর' জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. আল্লাহ তায়ালা 'সব ধরনের মানুষের কাছে' তাঁর রসূলকে কুরআন পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. কাফির-মুশরিকসহ 'সব মানুষের কাছে' তাঁর সাধ্যানুযায়ী কুরআন পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন।

৫. রসূল সা. 'সকল মানুষের' কাছে কুরআন পৌঁছাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু কাফির (নেতারা) জনগণকে কুরআন থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা কুরআন পৌঁছাবার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬. তাছাড়া কুরআন 'গোটা মানবজাতিকে' এক আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান জানায়। সেজন্যে কুরআন গোটা মানবজাতির পাঠ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের একমাত্র প্রভুর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা ২ বাকারা : ২১)

৭. এছাড়া রসূল সা.-এর সময় কাফির-মুশরিকরা কুরআন পড়েছে, শুনেছে বুঝেছে, তারপর কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছে। আল্লাহ তায়ালাও কুরআনেই আবার তাদের সেসব মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন। যেমন :

ক. 'কাফিররা বলেঃ এ (কুরআন) তো মিথ্যা মনগড়া জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সে (মুহাম্মদ) নিজে রচনা করেছে আর অন্য কিছু লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।'-সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৪।

খ. 'তারা কি বলে যে : সে (মুহাম্মদ) এই কুরআন রচনা করেছে? তুমি বলো, তবে তোমরাও এ কুরআনের (সূরার) মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও।' -সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৩৮।

পরিষ্কার হলো, মুহাম্মদ সা. গোটা মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। কুরআন গোটা বিশ্ব মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। রসূল সা.-এর যুগে মুমিনরা ছাড়াও কাফির, মুশরিক, ইহুদি, খৃস্টান সকলেই কুরআন পড়েছে, শুনেছে, বুঝেছে। তারপর এর দ্বারা কেউ হিদায়াতের পথে এসেছে, আবার কেউবা কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, অমুসলিমদের কুরআন থেকে হিদায়াত (সঠিক পথ) সন্ধান করার অধিকার আছে কি? এর জবাবে বলবো, হ্যাঁ, উপরে বর্ণিত অকাট্য দলিল থেকে সুপ্রমাণিত হয়ে গেছে যে-

ক. কুরআন বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন-বিধান। সুতরাং হিদায়াতের সন্ধান প্রদানের জন্যে সকল মানুষকেই কুরআন পড়তে দিতে হবে। আর যারা হিদায়াতের সন্ধান পেতে চায় তারা তো অবশ্যি কুরআন পড়বে। আল্লাহর বিধান থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার অধিকার কার আছে?

খ. রসূল সা. অমুসলিমদের কাছেই কুরআন পেশ করেছিলেন, তারপর কেউ ঈমান এনেছে, কেউ আনেনি। সকল মানুষের কাছে কুরআন পেশ করার জন্যে রসূল সা. কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গ. তাই এটা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য কাজ যে, তারা অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেবে। আর কোনো অমুসলিম যদি নিজেই আগ্রহী হয়ে কুরআন পড়তে চান, তবে তিনি যেখানে কুরআন পাবেন, সেখান থেকেই কুরআন নিয়ে পড়ার, বুঝার ও গবেষণা করার অধিকার রাখেন। যেমনঃ আল্লাহর দেয়া আলো, বাতাস যে কেউ যখন তখন গ্রহণ করার অধিকার রাখে, যেমনি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে যে কেউ গবেষণা করার অধিকার রাখে, ঠিক তেমনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ আল্লাহর আয়াত (কুরআন) পাঠ করার, বুঝার এবং এ নিয়ে গবেষণা করার অধিকার রাখে। তারপর সে সত্য গ্রহণ করবে কি করবে না, সে দায় দায়িত্ব তার। তাকে হিদায়াত করা, না করার বিষয়টি আল্লাহর হাতে। দেখুন আল্লাহর বাণী :

১. 'এই কাফিররা যখন 'আয যিকর' (আল কুরআন) শুনে, তখন তারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেনো তারা তোমার মুলোৎপাটন করে ছাড়বে। আর তারা বলেঃ (কুরআন পেশকারী) এই লোকটি নিশ্চয়ই পাগল।' অথচ এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক মহান উপদেশ।' -সূরা ৬৮ আল কলম : আয়াত ৫১-৫২।

২. (তাদের দাবি) কখনো মানা হবে না। এ (কুরআন) তো একটি উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।' -সূরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির : আয়াত ৫৪।

৩. 'এই লোকদের কি হলো যে, তারা এই মহান উপদেশ (আল কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।' -সূরা ৭৪ মুদ্দাসির : আয়াত ৪৯।

৪. 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে? -সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪।

৫. 'হে আহলে কিতাব (ইহুদি-খৃস্টানরা)! ... আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলো এবং সুস্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানকারী, এ কিতাব দ্বারা আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার (কুফর ও শিরক) থেকে আলোতে (ঈমান ও ইসলামের দিকে) নিয়ে আসেন আর তাদেরকে পরিচালিত করেন সঠিক পথে।' -সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ১৫-১৬।

কুরআনের এই আয়াতগুলো থেকে অনেকগুলো বিষয় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো :

১. কুরআন গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ গ্রন্থ।

২. মুহাম্মদ রসূল সা. কাফিরদের কাছে কুরআন পেশ করতেন। তারা কুরআন শুনে ভ্রু-কুটি করতো। তারা কুরআন শুনে তাকে পাগল বলতো।

৩. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ গ্রন্থ। যে কেউ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, করতে পারে।

৪. কাফিরদের কাছে রসূল সা. কুরআন পেশ করতেন। তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

৫. কাফিররা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতো না, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের তিরষ্কার করেছেন। বলেছেন, তাদের অন্তর কুরআন বুঝার ব্যাপারে তালাবদ্ধ হয়ে আছে নাকি?

৬. আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জন্যে কুরআন নাযিল করেছেন।

৭. যে কেউ কুরআন থেকে হিদায়াত অনুসন্ধান করতে পারে। যে কেউ এর উপদেশ গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে।

৮. যাদের কাছে কুরআন পেশ করার পরও তারা হিদায়াতের পথে আসেনি, তাদের বিপথগামিতার জন্যে নবী বা কুরআন পেশকারী দায়ি থাকবেন না।

৯. এই কুরআন ইহুদি-খৃস্টানদের জন্যেও এসেছে। তারা আল্লাহর সন্তোষ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা চাইলে তাদেরকে কুরআনের পথে আসতে হবে। এ জন্যে তাদেরকে কুরআন পড়তে, বুঝতে ও মেনে নিতে হবে।

১০. কুরআন হলো আলো। যে কেউ অন্ধকার থেকে এ আলো দ্বারা মুক্তির ও কল্যাণের পথে আসতে পারে।

কুরআন থেকে অমুসলিমদের হিদায়াত সন্ধান করার অধিকার অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। স্বয়ং কুরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হলো, পৃথিবীর যে কোনো মানুষ কুরআন থেকে হিদায়াত সন্ধান করতে পারে, করা উচিত। করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া তাদের কাছে কুরআন পেশ করা মুমিনদেরও অবশ্য অবশ্য কর্তব্য কাজ।

* * *

৮

ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়

১. দীন ও শরীয়ত

এ যাবত আমরা ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঈমান ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতিসমূহকে বলা হয় দীন। সকল নবীর দীন ছিলো একই।

দীনের বিধি বিধান, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পন্থা, ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি, পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, পারস্পারিক লেনদেন ও আদান প্রদানের নিয়ম-কানুন, হালাল হারামের সীমা ইত্যাদিকে বলা হয় শরীয়ত। যেমন :

আল্লাহকে জানা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি ও হুকুম পালন করা হলো- দীন। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালন ও ইবাদত বন্দেগি করার নিয়ম-কানুন, পন্থা-পদ্ধতি ও সীমারেখার নাম হলো- শরীয়ত।

দীন বলে : মানুষ হত্যা করা, ব্যভিচার করা, অপবাদ দেয়া, চুরি করা, ছিনতাই করা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ ও পাপের কাজ।

শরীয়ত বলে : সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দাও, ব্যাভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত করো, অপবাদদানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করো, চোরের হাত কেটে দাও, ছিনতাইকারীর এক হাত এক পা কেটে দাও।

দীন বলে : এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করো।

শরীয়ত বলে : দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ো, পূর্বদিকে সাদা রেখা দেখা দেয়ার পর সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত। ফজর নামায দুই রাকাত। নামায পড়ার নিয়ম এই এই। এই এই কাজ দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়।

সকল নবীর দীন একই ছিলো। তবে তাঁদেরকে যে শরীয়ত দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ছিলো।

২. দীন ও শরীয়তের উৎস

আল্লাহর দেয়া দীন ও শরীয়ত সম্পর্কে জানার উপায় কী? এর উৎস কী?

আল্লাহর দেয়া দীন ও শরীয়ত তথা ইসলাম সম্পর্কে জানার উৎস ও উপায় হলো- আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। এ দুটো আঁকড়ে ধরলে কখনো তোমরা বিপথগামী হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ।' -মুসনাদে আহমদ। বিদায় হজ্জের ভাষণ।

৩. হালাল ও হারাম

আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক। তিনি মানুষের কল্যাণ চান। কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে মানুষের অকল্যাণ, স্রষ্টা হিসেবে তিনিই তা ভালো জানেন।

মানুষের কল্যাণার্থে তিনি মানুষের জন্যে কিছু কাজ-কর্ম, কিছু আচার-আচরণ কিছু আহার-বিহার হারাম করে দিয়েছেন।

হারাম মানে- অবৈধ ও নিষিদ্ধ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন:

তাঁর সাথে শিরক করা, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও সাজদা করা, মানুষের কাছে প্রার্থনা করা, মুনাফেকী করা, মনগড়া বা মানুষের তৈরি আইন কানুন অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাপ করা, আমানতের খিয়ানত করা, মানুষের ক্ষতি করা, পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, প্রতারণা করা, গীবত করা, পরনিন্দা করা, ব্যভিচার করা, মানুষ হত্যা করা, কারো অধিকার নষ্ট করা, যুলম করা, সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, রক্তপান করা, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা, শুয়োরের গোস্ত খাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা এগুলো এবং এ রকম আরো অনেক কিছু হারাম করে দিয়েছেন। তাই শরীয়তে এগুলো নিষিদ্ধ।

কোনো একটি নিষিদ্ধ কাজ করাটা কবীরা গুণাহ এবং ফাসেকী। তওবা না করলে ফাসিকদের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যেসব জিনিস হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে যে জিনিসগুলো হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলো ছাড়া বাকি সবই হালাল। হালাম মানে- বৈধ ও করণীয়।

৪. জায়েয ও না-জায়েয

শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয মানে- বৈধ বা অনুমতি আছে এমন কাজ। আর না-জায়েয মানে- অবৈধ বা অনমুতি নেই এমন কাজ।

৫. হারাম ও না-জায়েযের প্রকারভেদ

ইসলামি শরীয়া বিশেষজ্ঞগণ হারাম ও না-জায়েয বিষয়সমূহকে গুরুত্বের দিক থেকে ভাগ করেছেন। তাঁরা কুরআন সুন্নাহ্ বিশ্লেষণ করে হারাম ও না-জায়েয বিষয়গুলোকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলোঃ

১. হারাম। ২. মাকরূহ।

ইসলামি শরীয়ার পরিভাষা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যেসব বিষয় অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত সেগুলোই হারাম। যেমনঃ

মানুষ হত্যা, ব্যাভিচার, সুদ, মদ, জুয়া, আস্তানায় কুরবানী, ভাগ্য গণনা, শুয়োরের গোশত খাওয়া, মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া, রক্তপান করা ইত্যাদি।

আর যেসব জিনিস হারাম না হলেও হারামের কাছাকাছি, কিংবা যেগুলোতে হারামের স্পীরিট বিদ্যমান অথবা যেগুলোতে হারামের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, অথবা প্রমাণিত হারামের সদৃশ, কিংবা অন্তত নিন্দনীয় বা অপছন্দীয় বলে প্রমাণিত, সেগুলোই মাকরূহ।

৬. পালনীয় নির্দেশের প্রকারভেদ

কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে গুরুত্ব অনুযায়ী শরীয়তের পালনীয় নির্দেশসমূহ দুই প্রকার। সেগুলো হলো :

১. ফরয ও ২. নফল।

ফরযঃ ফরয মানে- আল্লাহর অলংঘনীয় নির্দেশ, যা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম পালন করা অবশ্য কর্তব্য এবং কিছুতেই যেগুলো লংঘন করা যায় না, লংঘন করলে আল্লাহ্ তায়ালা কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন, সেগুলোই ফরয হুকুম। যেমনঃ দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া, রমযান মাসে রোযা রাখা, সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, ওয়াদা পূরণ করা, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা, উত্তরাধিকার বন্টন করা, সঠিক মাপ ও ওজন দেয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, ভালো কাজের আদেশ দেয়া, মন্দ কাজে বাধা দেয়া, নামাযের জন্যে পবিত্র হওয়া, অযু করা, ইসলামের জ্ঞানার্জন করা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা, ন্যায় বিচার করা, প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি।

কোনো ফরয কাজ অমান্য করা ফাসেকী এবং কবীরা গুনাহ।

নফল : ফকীহ্গণ গুরুত্ব অনুযায়ী নফল আহকাম কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলোঃ ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. মুস্তাহাব।

ওয়াজিব : ওয়াজিব মানে- করণীয় বা কর্তব্য। ওয়াজিব হলো সেইসব কাজ যেগুলো ফরয নয়, তবে রসূল সা. সেগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। যেমনঃ বিতর নামায পড়া, দুই ঈদের নামায পড়া, কুরবানী করা, মযলুমের সাহায্য করা, জামাতে নামায পড়া, সালামের জবাব দেয়া, সাদাকাতু ফিতর আদায় করা, দাওয়াত কবুল করা ইত্যাদি।

সুন্নত : সুন্নত হলো সেইসব কাজ, সেইসব আচার-আচরণ ও ইবাদত বন্দেগি যেগুলো পালন করাকে রসুল সা. তাঁর নিয়মে পরিণত করেছিলেন এবং যেগুলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। যেমনঃ ফরয নামাযে আগে-পরে ১২ রাকাত নামায পড়া। দান-সাদকা করা। আশুরার দিন রোযা রাখা। উমরা করা। সহজ সরল আচরণ করা। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। মৃতের দাফন-কাফন করা। রোগীর সেবা করা। মেহমানদারি করা। বিয়ে শাদী করা। মসজিদ নির্মাণ করা। মানুষের সেবা ও উপকার করা। সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন যাপন করা। দাড়ি রাখা। সালাম দেয়া। হাসিমুখে কথা বলা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ভালো কাজ আল্লাহর নামে আরম্ভ করা। বিপদে সাহায্য করা। অপরের কল্যাণ কামনা করা। দুঃখ -মুসিবতে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ধার কর্জ দেয়া ইত্যাদি।

মুস্তাহাব বা নফল : নফল ও মুস্তাহাব হলো সেইসব আমল, আচরণ ও ইবাদত বন্দেগি, রসূল সা. যেগুলোকে নিয়মে পরিণত করেননি। তবে কখনো কখনো করেছেন। নিয়মিত না করলেও পছন্দ করেছেন। যেমনঃ সুযোগ পেলেই নামায পড়া, মাঝে মাঝে রোযা রাখা, দান করা, উমরা করা ইত্যাদি।

৭. গুনাহ বা পাপ

গুনাহ মানে- পাপ, গুনাহ মানে অপরাধ। শরীয়তের বিধান অমান্য করাই গুনাহ। গুনাহ দুই প্রকার :

ক. কবিরা গুনাহ ও খ. সগিরা গুনাহ

কবিরা গুনাহ মানে- বড় পাপ। সগিরা গুনাহ মানে- ছোট পাপ।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে কাজ হারাম করে দিয়েছেন, সে কাজ করা কবিরা গুনাহ।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে কাজ ফরয করে দিয়েছেন, সে কাজ না করা কবীরা গুনাহ।

এই হলো কয়েকটি কবীরা গুনাহ :

আল্লাহর সাথে শিকর করা। রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা। যিনা ব্যভিচার করা। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা। সুদ খাওয়া। ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। মদ খাওয়া। আমানতের খিয়ানত করা। ফরয নামায না পড়া। যাকাত না দেয়া। রমযান মাসের রোযা না রাখা। যুলম করা। প্রতারণা করা। কারো অধিকার হরণ করা। গীবত করা। আল্লাহর যে কোনো হুকুম অমান্য করা ইত্যাদি।

কবিরা গুনাহ্ করলে মানুষ যালিম ও ফাসিক হয়ে যায়। তওবা না করলে কবিরা গুনাহ মাফ হয় না। তাই গুনাহ হয়ে যাবার সাথে সাথে তওবা করা সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

৮. তওবা

'তওবা' আরবি শব্দ। তওবা মানে- অনুতপ্ত হয়ে এবং অনুশোচনা করে সঠিক পথে ফিরে আসা।

কেউ যখন কোনো হারাম কাজ করে ফেলে, কিংবা কোনো ফরয কাজ লঙ্ঘন করে, তখন এতে তার কবীরা গুনাহ্ হয়ে যায়। এ থেকে মুক্তির উপায় হলো তওবা করা।

হারাম কাজ করে ফেললে কিংবা ফরয লংঘন করে ফেললে এর জন্যে :

ক. বিনয়ের সাথে অনুতপ্ত হওয়া ও অনুশোচনা করা।
খ. আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা।
গ. পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।
ঘ. কিছু নফল রোযা রেখে, কিংবা কিছু নফল নামায পড়ে, কিংবা কিছু দান করে গুনাহের কাফফারা আদায় করা।
ঙ. এমন কাজ আর কখনো না করার প্রতিজ্ঞা করা।

চ. কারো অধিকার হরণ করে থাকলে তা ফেরত দেয়া এবং

এ ছয়টি কাজের মাধ্যমেই তওবা করতে হয়। যে ব্যক্তি এ রকম খালিসভাবে তওবা করেন, আশা করা যায় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান।

* * *

৯

আনুষ্ঠানিক ইবাদত

১. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদত

ইবাদতের তাৎপর্য সম্পর্কে 'ইবাদত ও খিলাফত' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সংক্ষেপে- 'আল্লাহর হুকুম মতো জীবন-যাপন করার নামই ইবাদত।'

আল্লাহর ইবাদত করার জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে নির্দেশ দিয়েছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা তোমাদের মালিক ও প্রভু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।'-সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২১।

কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থ : কেবল আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি।' -সূরা ৫১ আয যারিযাত : আয়াত ৫৬।

আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ পাক মানুষকে শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে, কেবল তাঁরই হুকুম পালন করতে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে, কেবল তাঁরই দাসত্বের জীবন যাপন করতে এবং কেবল তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করলে মুমিনের গোটা জীবনই হয় ইবাদতের জীবন। তখন তার প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদতের মধ্যে কাটে। তখনই সে হয় আল্লাহর প্রকৃত দাস বা দাসী।

২. আনুষ্ঠানিক ইবাদত

সারা জীবনের সকল কাজ আল্লাহর হুকুম মতো পালন করাটাই আল্লাহর ইবাদত। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদত করারও হুকুম করেছেন। পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত বড় ফরয। সেগুলো হলো :

১. সালাত কায়েম করা।
২. যাকাত প্রদান করা।
৩. রমযান মাসে রোযা রাখা।
৪. সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা।
৫. দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করা।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদেই এ কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের মাধ্যমে মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৩. সালাত

আল্লাহর বড় বড় হুকুমের একটি হলো সালাত কায়েম করা। ঈমান এনে মুসলিম হবার পর সালাত আদায় করাই পয়লা ফরয।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন মজিদে আমাদের হুকুম করেছেন :

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থ : সালাত কায়েম করো।'

বহুবার আল্লাহ পাক কুরআনে সালাত কায়েম করার হুকুম করেছেন। সালাত ছাড়া আর কোনো কাজের হুকুম এতোবার করেননি। তাই সালাত কায়েম করা একজন মুসলিমের সবচাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সালাত কায়েম করা মানে- প্রতি ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, সময় মতো আদায় করা, সালাতের সব নিয়ম কানুন ঠিকমতো পালন করা, সালাতের সময় হলে সবাইকে সালাতের দিতে ডাকা এবং সবাই মিলে একত্রে সালাত আদায় করা।

সালাত সম্পর্কে একটি আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

৪. যাকাত

ক. যাকাতের অর্থ ও গুরুত্ব : যাকাত আরবি শব্দ। 'যাকাত' মানে- পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন করা। মহান আল্লাহ যাদেরকে অর্থ সম্পদ দান করেছেন, বছর শেষে তাদের কাছে জমা অর্থ সম্পদের ২.৫% (শতকরা আড়াই ভাগ) আল্লাহর নির্ধারিত খাতে প্রদান করাকে 'যাকাত' বলা হয়। এভাবে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত দাতার মন ও অর্থ-সম্পদ পবিত্র হয়। আর এভাবেই সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি ঘটে।

যাকাত প্রদান করা ফরয। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অনেকবার সালাতের সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম করো আর যাকাত প্রদান করো। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৪৩, ১১০।

যাকাত কারা পাবে : যাকাত প্রদান করার খাত আটটি। কুরআনে সূরা ৯ আত্ তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে সেই আটটি খাতের বর্ণনা রয়েছে :

১. ফকির।
২. মিসকীন।
৩. সরকারের যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন।
৪. ইসলামের পক্ষে যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদেরকে।
৫. মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির কাজে।
৬. ঋণের ভারে দেউলিয়াকে ঋণ থেকে মুক্তির জন্যে।
৭. আল্লাহ্‌র পথে।
৮. নিঃস্ব পথিককে।

যাকাত আদায় করে এসব খাতে ব্যয় করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ইসলামি সংগঠন ও সংস্থাগুলোর এ মহান দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।

যাকাত উন্নত সমাজ গড়ার হাতিয়ার : যাকাত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ। যাকাত একটি ফরয ইবাদত বটে। সেই সাথে যাকাত সুস্থ্য, সুন্দর এবং দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার মজবুত হাতিয়ার।

অনৈসলামি সমাজে ধনী লোকেরা এবং ধনী সংস্থাগুলো অভাবী লোকদের ঋণ দিয়ে তাদের থেকে কড়া এবং চড়া হারে সুদ উসুল করে। সুদের মাধ্যমে ধনী লোকেরা দরিদ্র লোকদের টাকা চুষে নিয়ে যায়। এভাবে পুঁজিবাদী সমাজে টাকা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে চলে যায়। এতে ধনীরা আরো ধনী হয়। আর গরীবরা হয় আরো গরীব। সুদের ভিত্তিতে নেয়া টাকা লস হলে গরীবদের বাড়ি ঘর, জমিজমা, গরু ছাগল পর্যন্ত হারাতে হয়।

যাকাত ঠিক সুদের বিপরীত। ধনীদের উদ্বৃত্ত, জমা ও বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পদ থেকে স্বয়ং আল্লাহ প্রতি বছর ২.৫০% হারে গরীবদের যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ইসলামি সমাজের ধনীদের অর্থ-কড়ির একটা অংশ বিনা শর্তে গরীবদের হাতে চলে যায়। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক নিয়মে টাকা পয়সার স্রোত উপরের দিক থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে গরীবদের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দীক্ষার হার বাড়ে। সমাজ উন্নত হয়।

যাকাত প্রাপ্তির মাধ্যমে গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। তারা ধনীদের পণ্য ক্রয় করে। এতে করে গরীবদের অবস্থার উন্নতি হবার সাথে সাথে ধনীরাও লাভবান হয়। পণ্যের বিনিময়ে টাকা তাদের কাছে ফিরে আসে। ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ক্রমান্বয়ে প্রতিবছর যাকাতের পরিমাণও বাড়ে।

যাকাত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এভাবে ইসলামি সমাজে টাকা পয়সা চাকার মতো ধনী ও গরীবদের মধ্যে ঘুরতে থাকে। আবর্তিত হতে থাকে সকলের কাছে। ফলে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে উঠে।

সকল মুসলিম দেশে ও মুসলিম সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। যতোদিন সরকারিভাবে যাকাত ব্যবস্থা চালু না হয়, ততোদিন ইসলামি সংগঠন ও সংস্থাসমূহ যাকাত উসুল ও বন্টনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। যাকাত গরীবদের প্রতি ধনীদের অনুগ্রহ নয়। বরং ধনীদের অর্থ-সম্পদে এটা গরীবদের আল্লাহর দেয়া অধিকার। সুতরাং এ অধিকার উসুল ও বন্টনের ব্যবস্থা থাকা অতীব জরুরি।

যাকাতের অর্থ দিয়ে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা দরিদ্র লোকদের জন্যে কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম চালু করতে পারে।

যাকাত প্রদান না করার পরিণতি : ধনী লোকদের যাকাত প্রদান করা নামাযের মতোই ফরয। যাকাত অস্বীকারকারী মুসলমান থাকে না। যে ধনী ব্যক্তি সঠিক হিসাব করে প্রতি বছর যাকাত পরিশোধ করে না, তার জন্যে রয়েছে কঠিন পরকালীন শাস্তি। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

"যারা সোনা রূপা (অর্থ সম্পদ) পূঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না। তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এমন একদিন আসবে, যেদিন তাদের সোনা রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠ দেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে : এই হলো তোমাদের সেসব অর্থ সম্পদ যা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। অতএব এখন নিজেদের জমা করে রাখা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো।" -সূরা ৯ তাওবা : আয়াত ৩৪-৩৫।

যারা যাকাত প্রদান করে না তাদের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

আল্লাহ যাকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি সে অর্থ-সম্পদের যাকাত প্রদান না করে, তবে তা কিয়ামতের দিন একটি বিষধর অজগরের রূপধারণ করবে, যার দু'চোখের উপর দুটি কালো চিহ্ন থাকবে। সে বলবে : আমিই তোমার অর্থ-

সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চয়। এতোটুকু বলার পর নবী করীম সা. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেনঃ 'যারা আল্লাহর দেয়া অর্থ-সম্পদে কার্পণ্য করে, তারা যেনো মনে করে না যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল, বরং এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। তারা যে অর্থ সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। -সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮০।' [বুখারি : আবু হুরাইরা]

৫. রমযান মাসের রোযা

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সূর্য উদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহারসহ আরো কতিপয় হালাল কাজ থেকে বিরত থাকাকে 'রোযা' বলা হয়।

প্রতি বছর পুরো রমযান মাস এভাবে রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে এ নির্দেশ দিয়েছেন :

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান লিখে দেয়া হলো, যেমন তা লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের উপর। আশা করা যায়, এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হবে।" -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৩।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

"রমযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এ গ্রন্থ মানব জাতির জন্যে পূর্ণ হিদায়াত এবং সুস্পষ্ট শিক্ষা, যা সত্য সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য করে দেয়। কাজেই, এখন থেকে তোমাদের যে ব্যক্তিই এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্যে এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য। তবে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা সফরে থাকে, সে যেনো অন্য সময় রোযা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধানকে সহজ করতে চান, কঠোর করতে চান না। তোমাদের এ বিধান দেয়া হলো যাতে করে তোমরা রোযার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারো, আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।" -সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৮৫।

এখানে আমরা রমযান মাসের রোযার বিরাট মর্যাদা ও কল্যাণ সম্পর্কে প্রিয় নবী সা. এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করছি :

১. রমযান মাসের আগমনে আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। -সহীহ বুখারি।

২. রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

৩. রমযান মাস এলে রহমতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

৪. তোমাদের উপর মহান ও মুবারক রমযান মাস ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি রাত্ আছে। -বায়হাকী।

৫. যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করে, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে অন্য সময় একটি ফরয আদায় করে। -বায়হাকী।

৬. যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি ফরয আদায় করে, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে অন্য সময় সত্তরটি ফরয আদায় করে। -বায়হাকী।

৭. রমযান সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো জান্নাত। -বায়হাকী।

৮. রমযান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। -বায়হাকী।

৯. রমযানে মুমিনের জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। -বায়হাকী।

১০. যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তা তার গুণাহ্ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। -বায়হাকী।

১১. যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে ঐ রোযাদারের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে, তবে ঐ রোযাদারের রোযা রাখার পুরস্কারের কমতি হবে না। -বায়হাকী।

১২. যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে তৃপ্তি পুরিয়ে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউজ (কাউছার) থেকে পান করাবেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। -বায়হাকী।

১৩. রমযানের প্রথম দশক রহমতের, মাঝের দশক ক্ষমার আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের। -বায়হাকী।

১৪. যে ব্যক্তি রমযান মাসে অধীনস্থদের উপর থেকে কার্যভার লাঘব করবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। -বায়হাকী।

১৫. যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্ম সমালোচনার সাথে রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বেকার গুণাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ মুসলিম।

১৬. যে ব্যক্তি রমযানের রাতে নামায পড়বে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে, তার পূর্বেকার গুণাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

১৭. যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে ইবাদত করবে, তার পূর্বেকার গুণাহ্-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

১৮. আল্লাহ বলেন : আদম সন্তানদেরকে তাদের নেক আমলের জন্যে দশ থেকে সাতশ' গুণ বিনিময় দেয়া হয়। তবে সাওমের কথা ভিন্ন। সাওম আমারই জন্যে,

আমি এর জন্যে যতো খুশি ততো বিনিময় দেবো। কারণ, রোযাদার আমারই জন্যে প্রবৃত্তির কামনা এবং পানাহার ত্যাগ করে। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

১৯. রোযাদারের জন্যে দুটি আনন্দের সময়: একটি হলো ইফতারের সময় আর অপরটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

২০. রোযা হচ্ছে একটি ঢাল। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

২১. রোযা এবং কুরআন বান্দাহর জন্যে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্যে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে: আমি তাকে রাতের নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। -বায়হাকী।

৬. আল্লাহর ঘরে হজ্জ করা

সৌদি আরবের মক্কায় রয়েছে আল্লাহর ঘর কা'বা। সেখানে আরো রয়েছে সাফা-মারওয়া পাহাড় এবং মিনা, মুজদালিফা ও আরাফাত নামক জায়গা। এগুলো হলো হজ্জের স্থান। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন।

হজ্জের দিনসমূহ হলে জিলহজ্জ মাসে ৯ থেকে ১৩ তারিখ। জিলহজ্জ মাসের এই নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে-মক্কায় গিয়ে ইহরাম বেঁধে এসব স্থানে হজ্জ পালন করতে হয়। হজ্জের দিনগুলোতে-

- কা'বা ঘরের অল্প দূরে মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে অবস্থান করতে হয়।
- কা'বা ঘর তওয়াফ করতে হয়।
- সাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি (সা'য়ী) করতে হয়।
- মাথা মুণ্ডন বা ছোট করে চুল কাটতে হয়।
- শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভে পাথর মারতে হয়।
- মিনায় কুরবানি করতে হয়।

এই কাজগুলো হজ্জ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। যার সামর্থ আছে, তার জন্যে মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

'যাদের যাবার সামর্থ আছে, তারা যেনো অবশ্যি আমার ঘরে গিয়ে হজ্জ পালন করে। এটা মানুষের উপর আমার অধিকার।' -সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭।

হজ্জ অনেক বড় মর্যাদাপূর্ণ সওয়াবের কাজ। প্রিয় নবী সা. বলেছেন :

'যারা হজ্জ ও উমরা পালনের জন্যে আল্লাহর ঘরে আসে, তারা আল্লাহর মেহমান।' তিনি আরো বলেছেন : 'যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সঠিকভাবে হজ্জ আদায়

করে, সে ঠিক সে রকম নিষ্পাপ হয়ে যায়, একটি শিশু যে রকম নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।' -মিশকাত।

যে মুমিন ব্যক্তির মক্কায় পৌছার সামর্থ আছে, তার উপরই হজ্জ করা ফরয। হজ্জ নারী-পুরুষ সবার জন্যেই ফরয। হজ্জের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করা হবে, তা হালাল উপার্জনের অর্থ হওয়া চাই। জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

হজ্জ মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন। হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশ, সব ভাষা ও সব বর্ণের মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের অটুট ঐক্য বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে। হজ্জে সমবেত হয়ে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করে :

১. আল্লাহ এক।
২. আল্লাহর কোনো শরীক নেই।
৩. সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ।
৪. সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর।
৫. মানুষের প্রতি সবকিছুই আল্লাহর দান।
৬. সার্বভৌমত্ব এবং নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।
৭. মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর দাস।
৮. সকল ঈমানদার মানুষ ভাই ভাই।
৯. দেশ, ভাষা, বংশ, বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।
১০. কা'বা মুসলমানদের কিবলা।
১১. মুহাম্মদ সা. বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ রসূল এবং একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয় নেতা।
১২. ইসলামই মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণের একমাত্র পথ।
১৩. আখিরাতের সাফল্যই মানুষের প্রকৃত সাফল্য।

৭. উমরা

উমরাও হজ্জেরই মতো একটি ইবাদত। হজ্জ বছরের একটি নির্ধারিত মাসের নির্ধারিত তারিখে পালন করতে হয়। কিন্তু উমরা সারা বছর সব সময় পালন করা যায়। যে কেউ মক্কায় গেলেই উমরা করতে পারেন।

ঈমানদার লোকেরা যে কোনো কাজে এবং যে কোনো ভাবেই মক্কায় পৌঁছুক না কেন, তাদের উমরার নিয়্যত করে উমরা পালন করা কর্তব্য।

উমরা পালনের মধ্যে রয়েছে বিরাট সওয়াব। উমরা পালনকারীরা হাজীদের মতোই আল্লাহর মেহমান। উমরা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা যায়।

নিয়্যত করে ইহরাম বেঁধে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ায় সা'য়ী করার মাধ্যমে উমরা পালন করতে হয়।

উমরা একটি সুন্নত ইবাদত। তবে বড়ই নেকীর কাজ।

৮. দীন প্রচার ও প্রবর্তনের কাজ করা

দীন প্রচার ও প্রবর্তনের সার্বিক কার্যক্রমকে কুরআনী পরিভাষায় বলা হয়েছে 'জিয়াদ ফি সাবিলিল্লাহ।' 'জিহাদ' মানে- সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা ও সংগ্রাম করা।

আল্লাহর হুকুম বা ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা, মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, ইসলামের দিকে ডাকা এবং পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের বিধান প্রবর্তন করার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করার নাম 'জিহাদ'। অন্যদিকে ইসলামের উপর আঘাত এলে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা-সংগ্রাম করাও জিহাদ। ভালো কাজের আদেশ দেয়া মন্দ কাজে বাধা দেয়াও জিহাদ।

সময়, শ্রম, অর্থ এবং বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ্ মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয (অবশ্য কর্তব্য) করে দিয়েছেন।

সাধ্য অনুযায়ী জিহাদ করা এবং জিহাদে অংশ নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "প্রকৃত মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর আর সংশয়ে লিপ্ত হয়নি; বরং নিজেদের জান-প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। এসব লোকেরাই ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী।" -সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৫।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

* * *

ইবাদত ও মুসলিম

১. ইবাদত কী?

ইবাদত আরবি শব্দ। এটি একটি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ হলো :

১. হুকুম পালন করা এবং গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয় ও অনুরাগের সাথে আনুগত্য করা।

২. পূজা অর্চনা করা; দু'আ প্রার্থনা, আরাধনা ও উপাসনা করা।

৩. একান্ত বিনীত, অনুগত, অনুরাগী হিসেবে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে দাসত্ব করে যাওয়া।

ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ হলো- এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তিনি রসূলের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয় ও অনুরাগের সাথে সেই জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করে যাওয়া। তাঁরই পূজা, অর্চনা, উপাসনা করা। কেবলমাত্র তাঁরই কাছে দু'আ, প্রার্থনা ও আরাধনা করা। এই আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, অর্চনা, উপাসনা, আরাধনা ও দু'আ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আর কাউকেও অংশীদার না করা, তাঁর নির্দেশের বিপরীত কারো নির্দেশ পালন না করা। তাঁর দেয়া জীবন পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক সকল মত, পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করা। একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে যাওয়া। এ ব্যাপারে কারো এবং কোনো কিছুর পরোয়া না করা।

২. ইবাদতের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য (FEATURES)

উপরে ইবাদতের যে অর্থ ও পরিচয় পেশ করা হলো, তা থেকে ইবাদতের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই হয়েছে, সেগুলো সাজিয়ে লিখলে এ রকম দাঁড়ায়:

১. আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান আনা।

২. মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর পূর্বেকার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।

৩. পরকালের প্রতি ঈমান রাখা।

৪. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে মানুষের জন্যে আল্লাহর প্রেরিত আদেশ-নিষেধ ও জীবন-ব্যবস্থা মেনে নেয়া।

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সাফল্যকে জীবনের লক্ষ্য বানানো।
৬. আল্লাহর প্রতি পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয় ও অনুরাগ পোষণ করা।
৭. একমাত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা।
৮. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করে যাওয়া।
৯. কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের জীবন যাপন করে যাওয়া।
১০. শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপাসনা, পূজা ও অর্চনা করা।
১১. কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আরাধনা ও ফরিয়াদ প্রার্থনা করা।
১২. উপরোক্ত কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার না বানানো।
১৩. আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কারো নির্দেশ পালন না করা।
১৪. আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক সকল মত, পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করা।
১৫. একমুখী হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে যাওয়া। এ ব্যাপারে কারো এবং কোনো কিছুর পরোয়া না করা।
১৬. ইবাদত হবে শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

৩. মুমিনের জীবনটাই ইবাদতের

এ যাবত আলোচিত সংজ্ঞা, উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে যিনি জীবন যাপন করেন, কেবলমাত্র তিনিই আল্লাহর ইবাদত করেন।

যিনি আল্লাহর ইবাদত করেন, তিনি 'আবদুল্লাহ বা আল্লাহর দাস।'

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। নবীদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদতের জীবন যাপন করারই নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

'কেবল আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি।' -সূরা ৫১ আয যারিয়াত : আয়াত ৫৬।

'হে মানুষ তোমরা তোমাদের মালিক ও প্রভু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।' -সূরা বাকারা : আয়াত ২১।

আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে এবং কেবল তাঁরই দাসত্বের জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

একজন মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকাতেই আল্লাহর ইবাদতের জীবন যাপন করবে বলে অঙ্গীকার করে। তাছাড়া যারা আল্লাহর ইবাদতের পথে জীবন যাপন করেছেন, তাদের পথে পরিচালিত করার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

করতে থাকে। ইবাদতের জীবন যাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে যারা অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের পথ থেকে দূরে রাখার মিনতি জানাতে থাকে। এভাবে সে প্রতি রাকাত নামাযেই বলতে থাকে :

"আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করবো এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাইবো। আমাদেরকে (ইবাদতের) সঠিক পথে পরিচালিত করো। সেসব মনীষীদের পথে, যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছো। ঐ লোকদের পথে নয় যারা তোমার (ইবাদতের পথ পরিহার করে) অভিশপ্ত হয়েছে, আর ঐ লোকদের পথেও নয়, যারা (তোমার ইবাদতের পথ থেকে সরে গিয়ে) বিপথগামী হয়েছে।" -সূরা ১ আল ফাতিহা : আয়াত ৫-৭।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, ইবাদত মানুষের পুরো জীবনের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি মুহূর্ত পরিব্যাপ্ত। একজন মুমিন মুহূর্তকালের জন্যেও ইবাদতের বাইরে যেতে পারেন না এবং ছোট কিংবা বড় এমন কোনো কাজও করতে পারেন না- যা ইবাদত নয়। অর্থাৎ মুমিনের পুরো জীবনটাই ইবাদতের জীবন।

৪. আল্লাহর দাসত্বের জীবন-যাপনকারীই মুসলিম

যিনি এক আল্লাহর দাসত্বের জীবন যাপন করেন। তিনিই মুসলিম। অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দাসত্বের জীবন যাপনের মাধ্যমেই মুসলিম হওয়া যায়।

আল্লাহর দাসত্ববিহীন অবস্থায় কেউ মুসলিম থাকতে পারে না।

আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে কুরআন পড়ে, হাদিস পড়ে। সে ভালোভাবে জানে কিভাবে মুসলিম হওয়া যায়? সে আল্লাহর ইবাদতের জীবন যাপন করে। তাই সে একজন মুসলিম।

আবদুর রাজ্জাকও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে বলে : আমার বাবা একজন মুসলিম। আমার দাদাও মুসলিম ছিলেন। তাই আমিও মুসলিম। কিন্তু, কিভাবে মুসলিম হতে হয় তা সে জানে না। আর কিভাবে জীবন যাপন করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাও সে জানেনা। ফলে যেভাবে জীবন যাপন করলে মুসলিম থাকা যায়, আব্দুর রাজ্জাক সেভাবে জীবন যাপন করে না। সে আল্লাহর ইবাদতের বা দাসত্বের জীবন যাপন করে না। তাই ইসলামি নাম রাখা সত্ত্বেও এবং বাবা-মা ও দাদা-দাদী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আবদুর রাজ্জাক সত্যিকার মুসলিম নয়।

মামুন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে। সেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে নামায পড়ে, রোযা রাখে, বাবার সাথে হজ্জও করে এসেছে। সে মনে করে সেক্যুলারিজম সর্বোত্তম মতাদর্শ।

সেক্যুলারিজম মানে- ধর্মহীনতা বা ধর্ম নিরপেক্ষতা। অর্থাৎ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাগতিক কোনো কাজে আল্লাহর এবং আল্লাহর দেয়া বিধানের কোনো অধিকার নেই। কেউ ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর হুকুম মানতে পারে। তবে ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে কিছুতেই আল্লাহ বা রসূলকে বা ধর্মকে টেনে আনা যাবে না।

মামুন এই মতাবাদে বিশ্বাস করে এবং তার জাগতিক সকল কাজ এই মতবাদের ভিত্তিতে সম্পাদন করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সত্ত্বেও, রোযা ও হজ্জ পালন করা সত্ত্বেও এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও মামুন মুসলিম নয়। কারণ সে মনে করে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালন করলেই চলবে; সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাগতিক অন্যান্য কাজে আল্লাহর হুকুম পালন করার দরকার নেই। সে ইবাদত বা আল্লাহর দাসত্বের জীবন-যাপন করে না।

মামুন একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর কয়েকটি হুকুম পালন করে। কিন্তু সামাজিক ও জাগতিক সকল কাজে সে :

- আত্মার দাসত্ব করে, স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে।
- আল্লাদ্রোহী নেতৃত্ব কর্তৃত্বের হুকুম মেনে চলে।
- আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন মেনে চলে।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকার স্বীকার করে না।
- সে তার জীবনকে রাষ্ট্র, সমাজ, শয়তান, আল্লাদ্রোহী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছে। কখনো সে এর ইবাদত করে আবার কখনো ওর। কখনো সে এর দাস। আবার কখনো ওর। সে এককভাবে আল্লাহর দাসত্ব করে না।

- যে ব্যক্তি এতোজনের দাস, সে আল্লাহর দাস হতে পারে না।
- আল্লাহর দাস অন্য কারো দাস হতে পারে না।
- সুতরাং মামুন মুসলিম নয়, সে একজন অমুসলিম।
- সে আল্লাহর দাস নয়।

মাইকেল স্টীফেন খৃস্টান বাবা-মার ছেলে, মৈত্রয়ী দেবী ব্রাহ্মণের মেয়ে, অলোক বড়ুয়া বৌদ্ধ বাবা-মার ছেলে, যশোয়া সিং শিখ বাবা-মার পুত্র, অনিল কুমার ক্ষত্রিয়ের পুত্র, অনিতা লারমা উপজাতি মেয়ে।

ছোট বেলা থেকেই এরা সবাই কাফিরের ছেলে মেয়ে। এদের প্রত্যেকের জীবনে বিপ্লবী ঘটনা ঘটেছে। এদের প্রত্যেকের ঘটনা মোটামুটি একই রকম।

দেখা যায়, ছোট বেলা থেকেই এরা ছিলো সত্য-সন্ধ্যানী। সত্যকে জানার এবং সঠিক পথে জীবন যাপন করার আকাঙ্ক্ষা তারা পোষণ করতো। তারা

প্রত্যেকেই কেউ শিক্ষকের, কেউ সহপাঠীর, কেউ সহপাঠিনীর, আবার কেউ বন্ধুর মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে। ফলে মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্যে তারা উদগ্রীব হয়ে উঠে।

এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করে। সেই সাথে তারা আল কুরআন পাঠ করে, হাদিস পাঠ করে, ইসলামি বিশেষজ্ঞদের লেখা বই-পুস্তক পাঠ করে। তাছাড়া প্রত্যেকেই একাধিক ইসলামি বিশেষজ্ঞের সাথে সাক্ষাত করে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে।

এভাবে জেনে বুঝে এবং বিচার বিবেচনা করে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইসলামই মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর দেয়া সত্য ও সঠিক জীবন-পদ্ধতি। জাগতিক শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি শুধুমাত্র ইসলামি জীবন যাপনের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। তারা মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জীবন যাপন করে। তাদের বাবা-মা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা সবাই মুসলিম, তারা আল্লাহর দাস। তাদের জীবন আল্লাহর ইবাদতের জীবন।

মাইকেল স্টীফেন, মৈত্রয়ী, অলোক বড়ুয়া, যশোয়া সিং, অনিতা লারমা এরা সবাই আল্লাহর হুকুম জানতে পেরে-

- কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে।
- মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।
- নিয়মিত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে।
- মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়।
- মানুষকে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করার দাওয়াত দেয়।
- মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে।
- সত্য কথা বলে।
- ন্যায় নীতি অবলম্বন করে।
- তারা নিজেদের বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়।
- হালাল উপার্জন করে।
- শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।
- আমানত রক্ষা করে।
- হকদারদের হক পরিশোধ করে দেয়।
- আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতে ব্যবসা করে।

- সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করে।
- রমযান মাসে রোযা রাখে।
- আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- তারা সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুম এবং রসূলের নীতির ভিত্তিতে করে।
- তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি লাভ।
- তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।
- তারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে।
- তারা বিনীতভাবে আল্লাহ্র সকল হুকুম পালন করে।
- তাছাড়া ওরা সবাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিষেধ করেছেন জেনে-
- আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কারো কোনো হুকুম মানে না।
- কোনো মূর্তি বা ভাস্কর্যের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে না।
- বাবা-মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে না।
- সুদ-ঘুষের সাথে সম্পর্ক রাখে না।
- প্রতারণা করে না, মানুষকে ঠকায় না।
- কোনো অশ্লীল কাজ করে না।
- মিথ্যা কথা বলে না।
- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।
- সালাত ত্যাগ করে না।
- দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে না।
- কারো পিছে তার নিন্দা করে না।
- কাউকেও অপবাদ দেয় না।
- শুয়োরের গোশত খায় না।
- রক্ত কিংবা মৃত পশু খায় না।
- তারা লোভ লালসা ও কামনা বাসনার পিছে ছুটে না।
- মদ কিংবা মাদকদ্রব্য সেবন করে না।
- জুয়া খেলে না।
- কোনো মাজার কিংবা আস্তানায় যায় না।
- কারো অধিকার নষ্ট করে না।
- কারো ক্ষতিসাধন করে না।
- কারো প্রতি অন্যায়-যুলুম করে না।
- তারা আল্লাহর নিষেধ করা কোনো কাজ করে না।
- তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করাকে ভয় করে।

- তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকে।
- তারা এ জগতের লাভের চাইতে পরকালের লাভকে বড় মনে করে।

মাইকেল, মৈত্রয়ী, যশোয়া, অলোক, অনিল এরা সবাই প্রকৃত মুসলিম।

কারণ এরা আল্লাহর বিধান মতো জীবন যাপন করে। এরা আল্লাহর দাসত্বের জীবন যাপন করে। এদের নাম যাই হোক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না। ওদের বাবা-মা যেই হোক না কেন, তাতেও কিছু যায় আসে না। নবীর সাহাবী খাদিজা, উমর, উসমান, আলী, খালিদ, সা'আদ, সায়ীদ, সুমাইয়া, সওদা যয়নব এরা নিজেদের অমুসলিম বাবা মায়ের রাখা নাম পরিবর্তন করেননি। কিন্তু তারা ছিলেন প্রকৃত মুসলিম।

আমরা এতোক্ষণ যা কিছু আলোচনা করলাম, এটাই ইবাদতের মর্মকথা। অর্থাৎ ইবাদত হলো-

- এক আল্লাহর প্রতি ঈমানভিত্তিক জীবন।
- কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত জীবন।
- আল্লাহর হুকুম পালনের জীবন।
- আল্লাহর নিষেধ করা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকার জীবন।
- আল্লাহর রসূলকে অনুসরণ করার জীবন।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালন ।
- জীবনের কোনো কাজে আল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্ত না থাকা।
- পুরো জীবনকে আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখা।

এভাবে যে-ই জীবন যাপন করবে, সে-ই মুসলিম, সে যার সন্তানই হোক না কেন। আর যে এভাবে জীবন যাপন করবে না, সে মুসলিম নয়, সে যার সন্তানই হোক না কেন। এমনকি নবীর সন্তান এবং নবীর বংশধর হলেও সে মুসলিম নয়।

আল্লাহর ইবাদতের জীবন যাপন করলে মুসলিম থাকা যায়। আল্লাহর ইবাদতের জীবন যাপন না করলে মুসলিম থাকা যায় না।

একজন মুসলিম শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর সকলের ইবাদত পরিহার করে। ইবাদত জীবনের সকল কাজে পরিব্যাপ্ত। একজন মুসলিম জীবনের কোনো কাজে এবং কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্ত হতে পারে না। কোনো কাজে আল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়া মানে- সে কাজে অন্য কারো ইবাদত করা।

* * *

১১

মুসলিম জীবনে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

১. জানা ছাড়া মানা যায় না

ইসলাম যেহেতু নিখুঁত মতাদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সে জন্যে জ্ঞান ছাড়া এ আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হওয়া যায় না। সহজ কথায় বলতে গেলে, ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার অপরিহার্য দাবি হলো, তাকে জানা ও মানা। আর মুসলিম বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যিনি ইসলামকে জানেন এবং মানেন।

অবশ্য এই মূলনীতিটি সকল কার্যকরী ও নির্বাহী ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের সর্বস্তরে ইসলামকে মানার ও কার্যকর করার জন্যেই পাঠিয়েছেন। না জেনে, না বুঝে যেহেতু কোনো কিছুই মানা ও কার্যকর করা যায় না, ইসলাম তো বটেই, সেজন্যে ইসলামকে জানা বুঝা এবং ইসলামের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞানার্জন করা অতীব জরুরি ও অপরিহার্য-ফরয।

মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি হিসেবে দীন ইসলামকে শুধু পাঠিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং ইসলামকে জানা-বুঝারও নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামের জ্ঞানার্জন করার। ইসলামের বাস্তব শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি রসূলও পাঠিয়েছেন। রসূল সা. শিক্ষক ও আদর্শ নেতা হিসেবে বাস্তবে শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁর সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন।

২. কুরআনের আলোকে জ্ঞানার্জন

আমরা এখানে ইসলামের জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আল কুরআন থেকে মহান আল্লাহর কিছু বাণী উল্লেখ করছি :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

১. 'পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' -সূরা আলাক : আয়াত ১।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

২. 'বলো: প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।' -সূরা তোয়াহা : আয়াত ১১৪।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

৩. 'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।' -সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৩।

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

৪. 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। -সূরা ৫৮ মুজাদালা : আয়াত ১১।

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

৫. 'যারা জানে আর যারা জানে না এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে?' -সূরা ৩৯ জুমার : আয়াত ৯।

৬. 'এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকরাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৮।

৭. আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে (তালুতকে) শাসক মনোনীত করেছেন, কারণ তাকে তিনি অঢেল মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।' -সূরা আল ২ বাকারা : আয়াত ২৪৭।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

৮. 'এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়ো না, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।' -সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ৩৬।

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ

৯. 'আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৩৯।

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

১০. 'আল কুরআন পাঠ করো তরতিলের সাথে -অর্থাৎ বুঝে বুঝে ভাব প্রকাশযোগ্য ভঙ্গিতে)।' -সূরা ৭৩ মুজ্জাম্মিল : আয়াত ৪।

১১. 'যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।' -সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৯৮।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

১২. 'আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।' -সূরা ৩৫ ফাতির : আয়াত ২৮।

১৩. 'কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বললো: তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ হয়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তার জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।' -সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৮০।

১৪. 'আল্লাহ অতি প্রশস্ত উদার মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, সে তো বিরাট কল্যাণের অধিকারী। শিক্ষা লাভ করে তো কেবল তারাই যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী'। -সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৬৮-২৬৯।

১৫. 'যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ (কর্মকৌশল) শিক্ষা দেয়, তোমাদের আরো শিক্ষা দেয় তোমরা যা কিছু জানো না সেগুলো।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৫১।

৩. হাদিসের আলোকে জ্ঞানার্জন

আল কুরআনের এ আয়াতগুলো থেকে মুসলিমদের জন্যে জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে রসূলুল্লাহও সা. বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন :

১. 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের সঠিক বুঝ-জ্ঞান দান করেন।' -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

২. 'সোনা রূপার খনির মতো মানুষও (বিভিন্ন প্রকারের) খনি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম (গুণ বৈশিষ্ট্যধারী) হয়ে থাকে, দীনের সঠিক বুঝ-জ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই উত্তম মানুষ হয়ে থাকে।' -সহীহ মুসলিম : আবু হুরাইরা রা.।

৩. 'জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানেই তা পাওয়া যাবে, প্রাপকই তার অধিকারী। -তিরমিযি।

৪. 'ইসলামের একজন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজারো (অজ্ঞ) ইবাদতগুজারের চাইতে ভয়ংকর।' -তিরমিযি।

৫. 'জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ।' -ইবনে মাজাহ, বায়হাকি।

৬. 'দীনের জ্ঞানী ব্যক্তি কতইনা উত্তম মানুষ। তার কাছে লোকেরা এলে তিনি তাদের উপকৃত করেন, আর না এলে তিনি কারো মুখাপেক্ষী হন না।' -রিযযীন, মিশকাত।

৭. 'জ্ঞানের আধিক্য (নফল) ইবাদতের আধিক্যের চাইতে উত্তম।" -বায়হাকি : আয়েশা রা.।

৮. 'সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, জ্ঞানীদের মধ্যে যারা উত্তম।' -দারমি।

৯. 'কোনো বাবা মা তাদের সন্তানদের উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করতে পারে না। -তিরমিযি।

১০. 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, তাতে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহর কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে নেয় তাদেরকে আল্লাহর রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকুল। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচন করেন। যার আমল (কর্ম) তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।' -সহীহ মুসলিম।

১১. 'ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণকারীদের জন্যে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় (অর্থাৎ তাদের সহযোগিতা করে ও উৎসাহিত করে)'। -মুসনাদে আহমদ।

১২. 'জ্ঞান লাভে নিরত ব্যক্তি তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত বলে গণ্য হয়।' -তিরমিযি, দারমি।

১৩. 'যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করে, এ কাজের ফলে তার অতীতের দোষত্রুটি মুছে যায়।' -তিরমিযি, দারমি।

১৪. 'তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শিখায়।' -বুখারি : উসমান রা.।

১৫. 'যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তা অর্জন করেছে, তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পেরে থাকে তবু তার জন্যে একগুণ প্রতিদান রয়েছে।' -দারমি।

১৬. 'রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা, সারা রাত (ইবাদতে) জাগ্রত থাকার চাইতে উত্তম।' -দারমি।

১৭. 'জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদতগুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদ পৃথিবীবাসীর কাছে তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীরা নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।' -আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ।

৪. কোন্ জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

জ্ঞানের রয়েছে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। একজন মুসলিমের জন্যে কোন্ জ্ঞান এবং কতটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয? এ বিষয়টি জানা থাকা জরুরি। ইসলামের আলোকে গুরুত্বের দিক থেকে জ্ঞানকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. দীন ও শরীয়া সংক্রান্ত জ্ঞান : এ জ্ঞান অর্জন করা ফরয। অর্থাৎ একজন মুসলিমকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকিদা সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। ইসলামের মৌল নীতিসমূহ তার জানা থাকতে হবে। শরীয়তের মৌলিক বিধি-বিধানসমূহ তার জানা থাকতে হবে। সর্বোপরি শরীয়তের মৌলিক বিধি-বিধানসমূহ পালন করা, প্রয়োগ করা এবং বাস্তবায়ন করার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি তার জানা থাকতে হবে। নিজের জীবিকা উপার্জনের হালাল ও বৈধ প্রক্রিয়া তার জানা থাকতে হবে। এসব জ্ঞান অর্জন করা তার জন্যে ফরয।

২. দীনের অনুসন্ধানী জ্ঞান : মুসলিমদের মধ্যে সর্বকালেই এমন এক গ্রুপ লোক ছিলেন এবং থাকতে হবে, যারা ইসলামের অনুসন্ধানী জ্ঞানার্জন করবেন এবং ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুগ-সমস্যা ও নতুন নতুন বিষয়সমূহের সমাধান পেশ করা এ গ্রুপের দায়িত্ব। দীনের অনুসন্ধানী জ্ঞানার্জন করা ফরয না হলেও ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ একদল লোককে অবশ্যি এ জ্ঞানার্জনে এগিয়ে আসতে হবে।

৩. মুস্তাহাব জ্ঞান : উপরোক্ত দুই ধরনের জ্ঞান ছাড়া মানব সমাজের জন্যে কল্যাণকর অন্যান্য জ্ঞানার্জন করা মুস্তাহাব বা পছন্দীয়।

৪. ক্ষতিকর জ্ঞান : যেসব বিষয়ের জ্ঞানে ব্যক্তি বা মানব সমাজের কোনো কল্যাণ নেই, বরং ক্ষতিকর ও সময় অপচয়কর, কোনো মুসলিমের উচিত নয় সেসব জ্ঞান অর্জন করা। রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই সেই জ্ঞান থেকে যাতে কোনো কল্যাণ নেই এবং সেই অন্তর থেকে যার মধ্যে তোমার ভয় নেই।'

* * *

১২

সালাত কায়েম করা

আমাদের দেশে সালাতকে নামায বলা হয়। নামাযের বদলে আমাদের 'সালাত' বলার অভ্যাস করা উচিত। কুরআনে নামায নয়, সালাতই বলা হয়েছে।

১. সালাতের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ আল কুরআনে অনেকবার সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে মুমিনদের জন্যে সালাত সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا

অর্থ : 'ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে।' -সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১০৩।

সালাত ত্যাগ করা কুফুরি। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'সালাত দীন ইসলামের স্তম্ভ।' তিনি আরো বলেন : 'কোনো ব্যক্তির কুফুরিতে নিমজ্জিত হবার পথ হলো সালাত ত্যাগ করা।' -সহীহ মুসলিম।

তিনি আরো বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কুফুরি করলো।' -সুনানু তিরমিযি।

২. সালাতের ফযিলত

সালাতের রয়েছে অনেক অনেক বেশি নেকী, কল্যাণ মর্যাদা ও সওয়াব।

সালাত কায়েম করলে দুনিয়াতেও যেমন দক্ষ ও ভালো মানুষ হওয়া যায়, ঠিক তেমনি সালাত আদায়ের মাধ্যমে আখিরাতের সফলতাও অর্জন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থঃ সফল হলো সেই সব মুমিন, যারা বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করে।' -সূরা ২৩ মু'মিনূন : আয়াত ১-২।

বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসূলুল্লাহ সা. সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন :

"আচ্ছা বলতো, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি প্রবহমান নদী থাকে, আর সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা জবাব দেন : জী-না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না।' তখন রসূল সা. বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণও ঠিক এ রকম। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, তার সে সালাত তার সমস্ত গুনাহ-খাতা মুছে ফেলবে।"

বুখারি ও মুসলিমের আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. বলেছেন : "আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সময় মতো নামায পড়া।"

৩. সালাত ও পাক-পবিত্রতা

পবিত্রতা অর্জন করা নামাযের অন্যতম পূর্ব শর্ত।

নামায পড়ার জন্যে পাক-পবিত্র হওয়া ফরয। আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: '(নামাযের জন্যে প্রস্তুতির সময়) তোমরা যদি অপবিত্র থেকে থাকো, তবে গোসল করে পবিত্র হয়ে নাও।' -সূরা আল মায়িদা : আয়াত ৬।

স্বপ্নদোষ, মাসিক হওয়া বা স্ত্রীর কাছে যাবার কারণে যদি কারো শরীর নাপাক হয়ে থাকে, তবে নামায পড়ার আগে তাকে গোসল করে পবিত্র হয়ে নিতে হবে। গোসল করার পানি পাওয়া না গেলে কিংবা রোগগ্রস্ত হলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে পবিত্র হতে হবে।

৪. সালাত ও অযু

নামায পড়ার জন্যে অযু করা ফরয। আল্লাহ্ তায়ালা নামাযের জন্যে অযু করার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ : 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন নামাযের জন্যে উঠো, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধুয়ে নাও, মাথা মাসেহ করে নাও এবং টাখনু-গিরা পর্যন্ত দুই পা ধুয়ে নাও।' -সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৬।

অযুর ধারাবাহিক নিয়ম হলো :

১. কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধুয়ে নেয়া।
২. কুলি করা (৩ বার)।
৩. নাকে পানি দেয়া (৩ বার)।

৪. পুরো মুখমণ্ডল ধৌত করা (৩ বার)।
৫. প্রথমে ডান, পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। (৩ বার করে)
৬. মাথা মাসেহ করা।
৭. প্রথমে ডান পরে বাম পা টাখনু গিরা পর্যন্ত ধৌত করা (৩ বার করে) চার থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত এ চারটি কাজ অযুর ফরয।

পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে এবং বমি হলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। ঘুমালেও অযু নষ্ট হয়ে যায়। অযু নষ্ট হলে পুনরায় নামায পড়ার জন্যে অযু করে নিতে হয়।

৫. অযুর বিকল্প

মহান আল্লাহ ইসলামের বিধানসমূহ সহজ করে দিয়েছেন।

কেউ যদি নামাযের সময় অযু করার জন্যে পানি না পায়, অথবা অসুখের কারণে কেউ যদি শরীরে পানি লাগাতে না পারে, তবে আল্লাহ্ পাক তার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা দিয়েছেন। সূরা মায়িদার ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এই ব্যবস্থা দিয়েছেন।

এই বিকল্প ব্যবস্থার নাম তাইয়াম্মুম। উক্ত দুই অবস্থায় তাইয়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। তাইয়াম্মুমের নিয়ম হলো- পাক পবিত্র মাটি বা ধূলোতে দুই হাতের তালু প্রথমে একবার মেরে নিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নেবে। অতপর আরেকবার মেরে নিয়ে ডান হাতে বাম হাত এবং বাম হাতে ডান হাত কনুই পর্যন্ত মুছে নেবে।

৬. মসজিদ

সালাতের সময় হলে মসজিদে সমবেত হয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের জন্যে কর্তব্য করে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুমিনদের মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছেন।

মসজিদ মানে- আল্লাহকে সাজদা করার জায়গা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন :

“সেইসব লোকেরাই আল্লাহর মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করবেঃ যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। কারণ এরাই সঠিক পথের অনুসারী।” -সূরা ৯ তাওবা : আয়াত ১৮।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানান।' -বুখারি শরীফ।

৭. আযান

আযান মানে- আহ্বান করা বা ডাকা। মসজিদে এসে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্যে আহ্বান করাকে আযান বলা হয়। সালাতের সময় হলে সালাতের জন্যে আযান দেয়া ইসলামের একটি জরুরি কাজ। যিনি আযান দেন তাকে বলা হয় মুয়াযযিন। কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনকে আল্লাহ্ পাক অনেক মর্যাদা দান করবেন।

কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে আযান দিতে হয়, সেগুলো হলো :

اَللّٰهُ اَكْبَرَ আল্লাহু আকবার (অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। ৪ বার।

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হুকুমদাতা নেই) ২ বার।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰه আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةْ হাইয়্যা আলাস্ সালাহ (অর্থ : সালাতের দিকে আসো) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ হাইয়্যা আলাল ফালাহ (সাফল্য অর্জনের কাজে আসো) ২ বার।

اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম (অর্থ : ঘুমের চেয়ে সালাত ভালো) ২ বার (শুধু ফজর নামাযে)

اَللّٰهُ اَكْبَرَ আল্লাহু আকবার (অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ২ বার।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা যায় না) ১ বার।

আযান শুনামাত্র কাজ কর্ম ও ঘুম ত্যাগ করে নামাযের প্রস্তুতি নেয়া এবং নামাযে আসা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

৮. জামাত কায়েম করা

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে নির্দেশ দিয়েছেন :

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থ : 'সালাত কায়েম করো'।

তিনি আরো বলেছেন :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থ : 'রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।'

কুরআন মজিদের এই নির্দেশের কারণে ফরয নামায জামাতের সাথে পড়া অবশ্য কর্তব্য।

রসূলুল্লাহ সা. ফরয নামায সব সময় জামাতের সাথে আদায় করেছেন।

সাহাবায়ে কিরামও ফরয নামায জামাতের সাথেই আদায় করেছেন।

রসূল সা. এর সময় ওযর ছাড়া কেউ জামাতে হাযির না হলে তাকে মুনাফিক মনে করা হতো।

অসুখ বিসুখ, ঝড়-বৃষ্টি বা সফরের কারণে খুব সমস্যা হলে ভিন্ন কথা। এ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় জামাতে নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। রসূল সা. এর সময় মহিলারাও জামাতে শরীক হতেন। তবে তাদের জন্যে নামাযের জামাতে হাযির হওয়া অবশ্য কর্তব্য নয়।

নামাযের জামাত কায়েম করার জন্যেই মসজিদ নির্মাণ এবং আযান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যারা জামাতে নামায পড়তে আসে না, রসূল সা. তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এমন কি তাদের ঘরে মহিলা এবং শিশু না থাকলে তিনি তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

জামাতে নামায আদায়কারী একাকী নামায আদায়কারীর তুলনায় সাতাশ গুণ বেশি পুরস্কার লাভ করবে। রসূল সা. এ সুসংবাদ দিয়েছেন।

৯. ফরয সালাত কয় ওয়াক্ত?

ওয়াক্ত মানে- সময়। প্রতিদিন কয়বার এবং কোন্ কোন্ সময় সালাত আদায় করতে হয়? হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।

প্রিয় রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর হুকুমে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয (আবশ্যিক) সালাত আদায় করতেন। সেগুলো হলো :

১. ফজর সালাত। সময় : ভোর রাতে পূবের আকাশে সাদা রেখা দেখা দেবার পর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।
২. যোহর সালাত। সময় : সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাবার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

৩. আসর সালাত। সময় : যোহর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।
৪. মাগরিব সালাত। সময় : সূর্যাস্তের পর থেকে ঘণ্টা খানেক সময়।
৫. এশা সালাত। সময় : মাগরিব নামাযের পর থেকে নিয়ে মধ্যরাত বা গভীর রাত পর্যন্ত এমনকি ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের সময় থাকে।

১০. কোন্ সালাত কতো রাকাত?

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মোট সতের রাকাত। সালাতের রাকাত সংখ্যা হলো:

১. ফজর সালাত : ২ রাকাত।
২. যোহর সালাত : ৪ রাকাত।
৩. আসর সালাত : ৪ রাকাত।
৪. মাগরিব সালাত : ৩ রাকাত।
৫. এশা সালাত : ৪ রাকাত।

পাঁচ ওয়াক্তে ১৭ রাকাত নামায পড়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর অকাট্য ফরয।

১১. সুন্নত সালাত

রসূলুল্লাহ সা. ফরয (আবশ্যিক) সালাতের আগে-পরে কিছু কিছু নফল (অতিরিক্ত) সালাত আদায় করতেন। ঐ নামাযগুলো তিনি প্রায় নিয়মিত আদায় করার কারণে সেগুলো তাঁর সুন্নতে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা সেগুলোকে সুন্নত নামায বলি। রসূলুল্লাহ সা. এর বিশিষ্ট সাহাবি উমর রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রা. বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ফরযের আগে-পরে নিম্নরূপ নামায পড়েছি :

"যোহরের আগে দুই রাকাত, যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, ইশার পরে দুই রাকাত এবং জুমার পরে দুই রাকাত। তবে জুমা মাগরিব ও ইশার পরে দুই রাকাত তিনি তার ঘরে পড়তেন। আমার বোন (রসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রী) হাফসা আমাকে বলেছেন : ভোরের আলো দৃষ্টিগোচর হবার পর (অন্য বর্ণনায়- ফজরের আযান দেয়ার পর) রসূলুল্লাহ সা. ফজরের আগে দু'রাকাত নামায খুব সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন।" -বুখারি ও মুসলিম।

এই হাদিসটি থেকে জানা গেলো, রসূলুল্লাহ সা. ফরয নামাযের আগে-পরে দশ রাকাত নামায পড়তেন। তবে রসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবা এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যোহরের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। -সহীহ মুসলিম।

সুতরাং তাঁদের দু'জনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সা. ফরয নামাযের আগে পরে ১২ রাকাত নামায পড়তেন।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি: 'যে মুসলিম ব্যক্তি প্রতিদিন ফরয নামায ছাড়াও (এই) বার রাকাত নফল নামায পড়বে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। -সহীহ মুসলিম।

রসূলুল্লাহ সা. ফরয নামাযের আগে-পরে এই দশ রাকাত বা বার রাকাত নফল নামায প্রায় নিয়মিতই পড়তেন। তাই এই নফল নামাযগুলো রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতে পরিণত হয়েছে।

১২. জুমার সালাত

মদিনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ সা. শুক্রবারে যোহর নামাযের পরিবর্তে জুমার নামায পড়তেন। তিনি জুমার নামায দুই রাকাত পড়তেন। যেখানে মুসলিমরা বসবাস করেন, সেখানে জুমার নামায পড়া ফরয।

তিনি যোহর নামাযের সময় জুমার নামায পড়তেন। জুমার নামাযের জন্যে মসজিদে এসেই উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ প্রদান করতেন। এই ভাষণকে আরবিতে খুতবা বলা হয়। ভাষণের মাঝখানে ক্ষণিক বসতেন। ভাষণ শেষে দুই রাকাত নামায পড়াতেন।

জুমার ফরয নামায শেষ করে রসূলুল্লাহ সা. ঘরে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। এই দুই রাকাতও তিনি নিয়মিত পড়তেন। তাই এই দুই রাকাত নফল নামাযও রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত।

১৩. তাহাজ্জদ সালাত

তাহাজ্জদ নামায বড়ই নেকীর নামায। তাহাজ্জদ নামায আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের একটি মোক্ষম উপায়।

রসূলুল্লাহ সা. কখনো মধ্যরাত, আবার কখনো শেষ রাতে উঠে ছয় বা আট রাকাত নামায পড়তেন। এই নামাযকেই তাহাজ্জদ নামায বলা হয়। তাহাজ্জদ মানে- রাত জাগা। অর্থাৎ তিনি রাত জেগে এই ছয় বা আট রাকাত নামায পড়তেন। এ নামায তিনি বাদ দিতেন না।

তিনি তাহাজ্জদ নামায নিয়মিত পড়তেন। তাহাজ্জদ নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ উপায়। এ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

১৪. বিতর সালাত

রসূলুল্লাহ সা. তাহাজ্জদ নামাযের পর বিতর নামায পড়তেন। বিতর মানে- বিজোড়। বিতর নামায মানে বিজোড় নামায।

রসূলুল্লাহ সা. বিতর নামায কখনো পাঁচ কখনো তিন রাকাত পড়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়। তবে তিন রাকাতের বর্ণনাটিই প্রসিদ্ধ ও অধিকতর সহীহ।

রসূলুল্লাহ সা. বিতর নামাযও নিয়মিত পড়তেন। তাই বিতর নামাযও রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত। নিয়মিত পড়তেন বলে অনেক ইমাম বলেছেন-এ নামায ওয়াজিব।

যাদের পক্ষে তাহাজ্জদ নামাযের জন্যে উঠা সম্ভব হয়না, তারা ঘুমোতে যাবার আগে কিংবা ইশার নামাযের পরে বিতর নামায পড়ে নিলে অসুবিধে নেই।

১৫. ঈদের সালাত

ঈদ মানে খুশি। রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের জন্যে বছরে দুইটি ঈদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতর। রমযানের রোযার শেষে পয়লা শাওয়াল তারিখ এই ঈদের দিন। দ্বিতীয় হলো ঈদুল আযহা। হজ্জ উপলক্ষে ১০ই জিলহজ্জ এই ঈদের দিন।

রসূলুল্লাহ সা. ঈদের দিন সূর্য উঠার পরে মাঠে গিয়ে মুসলিম জনগণকে সাথে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়তেন। দুই ঈদেই তিনি এমনটি করতেন। ঈদের নামাযের পর উপস্থিত নারী-পুরুষের উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশ মূলক ভাষণ দিতেন। ঈদের নামাযের পর এই ভাষণ শোনা জরুরি। এই ভাষণকে আরবিতে বলা হয় খুতবা বা ঈদের খুতবা।

১৬. ভ্রমণকালে সালাত কসর করা

রসূলুল্লাহ সা. যখন সফর বা ভ্রমণে বের হতেন, তখন চার রাকাতের ফরয নামায দুই রাকাত পড়তেন। তিন ও দুই রাকাতের নামায তিন ও দুই রাকাতই পড়তেন। রসূলুল্লাহ সা. ফজরের আগের দুই রাকাত এবং বিতর নামায ছাড়া ভ্রমণকালে অন্যান্য নিয়মিত সুন্নত নামায পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। ভ্রমণকালে এভাবে নামায সংক্ষেপ করাকে 'কসর' বলা হয়। কসর মানে- সংক্ষেপ করা।

১৭. দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়া

কেউ যখন সফর বা ভ্রমণে থাকে তখন সে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তে পারবে। আমাদের প্রিয় রসূল সা. যোহর-এর সময় সফরে রওয়ানা করলে যোহর-এর সাথে আসর নামায পড়ে নিয়ে রওয়ানা করতেন। যোহর-এর সময় হবার পূর্বে সফরে রওয়ানা করলে সূর্য ডোবার পূর্বে আসর-এর সময় যোহর এবং আসর একত্রে পড়তেন।

একইভাবে তিনি সফরকালে মাগরিব এবং ইশা একত্রে পড়ে নিতেন।

* * *

(১৩)

সুসমাজ গঠনে সালাতের শিক্ষা

সালাত শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সাথে সাথে সালাত মুসলিমদের একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সও বটে। মুসলিম হিসেবে সর্বোত্তমভাবে জীবন যাপন করার শিক্ষা সালাত থেকে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. সালাত আদায়ের জন্যে বেশ কিছু শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে আদর্শ জীবন-যাপনের শিক্ষা।

এখানে উল্লেখ করা হলো সালাতের কিছু বড় বড় শিক্ষা :

১. সময়ানুবর্তিতা : প্রতি ওয়াক্ত সালাতেরই সময় নির্দিষ্ট করা আছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করতে হয়। বরং ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করাই উত্তম। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় জামাতে শরিক হতে হয়।

শিক্ষা : এ থেকে আমরা সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা পাই। পড়া-লেখা, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত, খেলা-ধূলাসহ সকল কাজের জন্যেই সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত। আর সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই করা উচিত। সময়ের শুরুতেই আরম্ভ করা উচিত। কারণ, মুমিন জীবনের সময় বড়ই মূল্যবান।

২. আহবান : সালাতের সময় হবার সাথে সাথে আযান দেয়া হয়। আযানের মাধ্যমে মানুষকে আহবান জানানো হয় সালাত আদায় করতে বা আল্লাহর হুকুম পালন করতে আসার জন্যে। ডাকা হয় জামাতে শরিক হবার জন্যে এবং সফলতা লাভ করার জন্যে।

শিক্ষা : সব সময় মানুষকে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করতে আহবান জানানো উচিত। ভালো কাজ করতে আহবান জানানো উচিত। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনে জামাতবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহবান জানানো উচিত।

৩. শারীরিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা : সালাত শুরু করার আগেই মুসল্লিকে অযু করে, প্রয়োজনে গোসল করে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

শিক্ষা : প্রত্যেক মুসলিমকে সব সময় পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা উচিত। মহান আল্লাহ পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা লোকদের পছন্দ করেন। পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। অপবিত্রতা পরিবেশ নষ্ট করে, রোগব্যাধি সৃষ্টি করে।

৪. পোষাকের পরিচ্ছন্নতা : মুসল্লি (নামাযী) যে পোষাক পরে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা : প্রত্যেক মুসলিমের পোষাক-পরিচ্ছদ সব সময় পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। আবিলতা মুক্ত থাকা উচিত। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখো' -সূরা ৭৪ আল মুদ্দাসির : আয়াত ৪।

মূলত পবিত্র পরিচ্ছন্ন পোষাকেই সুস্থ থাকে দেহ আর সতেজ থাকে মন।

৫. আবাস নিবাসের পরিচ্ছন্নতা : সালাত আদায়ের জায়গা মসজিদ হোক কিংবা অন্য কোনো স্থান, তা অবশ্যি পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়।

শিক্ষা : এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় মুসলিমদের ঘর বাড়ি, অফিস আদালত, পথ ঘাট অবশ্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। এতেই গড়ে উঠে সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ।

৬. নিয়্যতের নিষ্ঠা : নিয়্যত মানে-সংকল্প। সালাত শুরু করার আগে মুসল্লিকে 'শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সালাত আদায় করছি'-এই নিয়্যত বা সংকল্প করতে হয়।

শিক্ষা : একজন মুসলিমকে সারাজীবন আল্লাহর জন্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যাওয়া উচিত। সকল ভালো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে করা উচিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে সকল মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা উচিত। নিয়্যতের নিষ্ঠা ছাড়া একদিকে যেমন কোনো কিছু সঠিকভাবে করা বা গড়া যায়না, তেমনি নিয়্যতের নিষ্ঠা ছাড়া আল্লাহর কাছেও কোনো কাজ কবুল হয়না। আর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছুই গড়া এবং সৃষ্টি করা যায়না।

৭. একমুখী হওয়া : কা'বা আল্লাহর ঘর। বিশ্বের সকল মুসলিম কা'বা মুখী হয়ে কিংবা কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে।

শিক্ষা : বিশ্বের সকল মুসলমানকে বিশ্বাসে ও কর্মে সব সময় আল্লাহমুখী থাকা উচিত। তাদেরকে সবসময় একমুখী ও এককেন্দ্রীক থাকা উচিত।

৮. রুকু ও সাজদা : প্রতি রাকাত সালাতে আল্লাহর কাছে মাথা নত করে রুকু ও সাজদা করতে হয়।

শিক্ষা : মুসলিমকে সব সময় আল্লাহর কাছে অবনত থাকা উচিত। সকল ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে

জীবন যাপন করা উচিত। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করতে এবং আত্মসমর্পণ করতে পারেনা।

৯. সঠিক পথের প্রার্থনা : একজন মুসল্লি প্রতি রাকাত সালাতে 'ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম' উচ্চারণ করে করে আল্লাহর কাছে সরল সঠিক পথের প্রার্থনা করে।

শিক্ষা : মুসলমানকে সব সময় সঠিক পথে চলা উচিত। কোনো মুসলিমের অন্যায়, অসত্য, বক্র ও ভ্রান্ত পথে চলা উচিত নয়।

১০. একাগ্রতা : তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একজন মুসল্লি একাগ্রভাবে কেবল সালাতের প্রতিই মনোযোগী থাকে। সালাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে-এমন কোনো কাজই সে এ সময় করেনা।

শিক্ষা : একজন মুসলমানকে তার প্রতিটি কাজ একাগ্রচিত্তে এবং মনোযোগের সাথে করা উচিত। একাগ্রতা সাফল্যের চাবিকাঠি।

১১. জামাত বা দলবদ্ধতা : ফরয সালাত দলবদ্ধ হয়ে জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যক।

শিক্ষা : নিজেদের দীনি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে প্রত্যেক মুসলিমের সব সময় ঐক্যবদ্ধ, দলবদ্ধ বা জামাতবদ্ধ হওয়া এবং থাকা উচিত। এ ধরণের সকল কাজই দলবদ্ধভাবে করা কর্তব্য।

১২. সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নেতা বানানো : জামাতে সালাত আদায়ের জন্যে একজনকে ইমাম বানাতে হয়। ইমাম মানে- নেতা। ইমামকে সততা, যোগ্যতা, জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হতে হয়।

শিক্ষা : মুসলমানদের উচিত, তাদের দীনি, দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ, যোগ্য, জ্ঞানী ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে নেতা বানানো।

১৩. নেতার আনুগত্য : সালাতে ইমামের কুরআন তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। ইমামের সাথে সাথে সালাতের যাবতীয় নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। কোনো কাজেই ইমামকে অমান্য ও অতিক্রম করা যায়না।

শিক্ষা : মুসলমানদের দলের, জামাতের বা রাষ্ট্রের নেতা যদি ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণ করে, তবে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

১৪. নেতার ভুল সংশোধন : ইমাম যদি নামাযের মধ্যে কোনো ভুল করে বসেন, তবে 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামকে সতর্ক করে দেয়া মুক্তাদিদের কর্তব্য। আর ভুল সংশোধন করে নেয়া ইমামের কর্তব্য।

শিক্ষা : দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের ভুল ধরিয়ে দেয়া জনগণের কর্তব্য। ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করে নেয়া নেতৃবৃন্দের কর্তব্য।

১৫. স্বেচ্ছাচারী নেতার আনুগত্য পরিহার : সালাতের মধ্যে ইমাম ভুল করলে বা ফরয লংঘন করলে মুক্তাদিদের কর্তব্য ইমামের সংশোধনের জন্যে 'আল্লাহু আকবার' বা 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া। ইমাম যদি সংশোধন করে নেন, তবে মুক্তাদির কর্তব্য ইমামের আনুগত্যের উপর অটল থাকা। কিন্তু ইমাম যদি তার বড় ধরণের ভুল সংশোধন করে না নেন, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম অমান্যকারী এই ইমামের সালাত বাতিল। তাকে হয় তার ভুল সংশোধন করে নিতে হবে, নতুবা পুনরায় সালাত পড়াতে হবে। কিন্তু তিনি যদি এর কোনোটাই না করেন, তবে মুক্তাদিদের কর্তব্য তার আনুগত্য পরিহার করা এবং নতুন ইমাম নির্বাচন করা।

শিক্ষা : দলীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ভুল ধরিয়ে দেয়ার পরও যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মতো দায়িত্ব পালন না করে, যদি জনগণের উপর স্বৈরাচারি শাসন ও হুকুম চালায়, তবে জনগণের কর্তব্য তাদের আনুগত্য পরিহার করা এবং তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে আল্লাহভীরু সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচন করা।

১৬. সকল মুসল্লির সমান অধিকার : সালাতের জামাতে যে কোনো কাতারে এবং যে কোনো স্থানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সকল মুসল্লির অধিকার সমান।

শিক্ষা : ইসলামি জামাত, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সদস্য ও নাগরিকের অধিকার সমান। কেউ কারো অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে না।

১৭. বিনয় : একজন মুসলিমকে একান্ত বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করতে হয়। কোনো প্রকার অহংকার ও আত্মম্ভরিতার স্থান এখানে নেই।

শিক্ষা : অন্যায় ও শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া ছাড়া একজন মুসলমানকে তার সকল কথা-কাজ ও আচার আচরণে বিনয়ী হওয়া উচিত।

১৮. মুহাম্মদ সা.-কে মূল নেতা মানা : প্রত্যেক নামাযেই তাশাহ্হুদ-এ মুহাম্মদ সা.-কে রসূল ও নেতা বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর জন্যে দয়া, রহমত ও বরকতের দোয়া করতে হয়।

শিক্ষা : মুসলিমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে মুহাম্মদ সা.-কে মূল নেতা মেনে তাঁর অনুসরণ ও অনুবর্তন করা কর্তব্য।

১৯. শান্তির পথে চলা : প্রতিটি নামাযই 'সালাম' বলে সকলের প্রতি শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করে সমাপ্ত করতে হয়।

শিক্ষা : সমাজের সব মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করা এবং সবাই মিলে শান্তির পথে চলা মুসলমানদের কর্তব্য।

এভাবে সালাত একদিকে যেমন নামাযীর আখিরাতের জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলে, অপরদিকে তেমনি নামাযীর পার্থিব জীবনকে করে তোলে সুন্দর উন্নত ও দক্ষ, তার পরিবেশকে বানিয়ে দেয় পরিচ্ছন্ন এবং সমাজকে গড়ে তোলে সুশৃংখল সমাজ হিসেবে।

* * *

ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন

১. ইকামতে দীন

ইসলাম শুধু তপজপ, পূজা উপাসনা, ধ্যান অর্চনা ও গুণকীর্তনের ধর্ম নয়। ইসলাম আল্লাহর দীন, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা বা জীবন যাপনের পদ্ধতি। ইসলাম মানব জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা।

তাই, মুসলিমদের জীবনকে ইসলামের পদ্ধতিতে পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা মুসলমানদের জন্যে ফরয।

দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার জন্যেই পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

অর্থ: তিনি আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি তার রসূল (মুহাম্মদ)-কে হিদায়াত ও সত্য জীবন-ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে সে এটাকে অন্য সকল মত ও পথের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করে।[১]

শুধু মুহাম্মদ সা.-কেই নয়, বরং সব নবীকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন সব নবীকেই তিনি এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন :

اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থ : তোমরা আমার দীন প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করো এবং এ বিষয়ে বিভক্ত হয়োনা'। -সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত ১৩।

---

১. এ বাক্যটি কুরআনে তিন স্থানে উল্লেখ হয়েছে: ক. সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৩, খ. সূরা ৪৮ আল ফাত্হ : আয়াত ২৮, গ. সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ৯।

আল্লাহর দীন যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিব্যাপ্ত, তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। মানুষ সামাজিক ও জাতীয় জীব এবং গোটা বিশ্ব তার জন্যে উন্মুক্ত। সে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার সম্পর্ক রয়েছে তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সাথে। তার অসংখ্য সম্পর্ক তার সমাজের সাথে। তার সম্পর্ক রয়েছে তার দেশ ও জাতির সাথে। তার সম্পর্ক রয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায় সমূহের সাথে।

মূলত, একজন মানুষের সম্পর্ক তার নিজের থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত। তাই, মানব জীবনের সকল পর্যায়ে দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আংশিক নয়।

اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

অর্থ: 'তোমরা ইসলামের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৮।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো, ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। একথাও বুঝা গেলো, মানুষ জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করেনা, সেসব ক্ষেত্রে সে শয়তানের অনুসরণ করে।

২. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত না থাকলে একজন মুসলিমের পক্ষে ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

ফলে মুসলমানদের সবচে বড় করণীয় ও অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হলো, তাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জিহাদ করা।

জিহাদ মানে- পূর্ণ প্রচেষ্টা, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

ইসলামের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে: 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্'। এর আভিধানিক অর্থ: 'আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সাধনা ও প্রচেষ্টা চালানো'।

তবে আল্লাহর দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার এই 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' কে বিভিন্ন দেশে এর সমার্থক বিভিন্ন পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত এর ইংরেজি পরিভাষা হলো: Islamic movement.

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান ও ইরানে এর প্রচলিত পরিভাষা হলোঃ 'তাহরীকে ইসলামি'

বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে এ প্রচেষ্টার নাম হলো : 'ইসলামি আন্দোলন'।

বর্তমানে সারা বিশ্বের সব দেশেই বিভিন্ন নামে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কাজ চলছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীদের তাঁর দীন কায়েমের জিহাদের নির্দেশ দিয়ে এ কাজের জন্যে তাদের মনোনীত করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

অর্থঃ '(হে ঈমানদার লোকেরা!) তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে। তিনি এ জন্যেই তোমাদের মনোনীত করেছেন।' -সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত ৭৮।

কুরআন মজিদে জিহাদকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সাফল্য লাভের উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে :

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর সন্তোষ লাভের উপায় অন্বেষণ করো আর জিহাদ করো তাঁর পথে। আশা করা যায় এভাবেই তোমরা সাফল্য অর্জন করবে"। -সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৫।

এ আয়াতে আল্লাহকে ভয় করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় তালাশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকেই উপরোক্ত দুটি জিনিস অর্জনের উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মজিদে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে শাস্তি থেকে রক্ষা, কল্যাণ লাভ, ক্ষমা পাওয়া, জান্নাতের অধিকারী হওয়া, সাফল্য অর্জন, আল্লাহর সাহায্য লাভ এবং দীনের বিজয় হাসিলের উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে :

"হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদের সেই ব্যবসায়ের কথা বলবো, যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা হলো) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (এ কাজ করলে) আল্লাহ তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবাহমান। চিরকাল থাকার জন্যে জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটা বিরাট সাফল্য। আর অন্য যেসব জিনিস তোমরা

চাও, তাও তোমাদের দেবেন, আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয় (হে নবী!) মুমিনদের সুসংবাদ দাও"। -সূরা আস্ সফ : আয়াত ১০-১৩।

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা ইসলামের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির নাম। মুহাম্মদ সা. যে পদ্ধতিতে জিহাদ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটাই ইসলামের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি। তাঁর পদ্ধতি ছিলো এই যে :

১. তিনি যুক্তি প্রমাণের সাথে মানুষকে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার দাওয়াত দিয়েছেন।

২. তিনি মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও বিধান অস্বীকার করার আহবান জানিয়েছেন।

৩. তিনি যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসেবে পেশ করেছেন এবং তাঁকে আল্লাহর রসূল মেনে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

৪. তিনি পুনরুত্থান, বিচার, প্রতিদান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের তথা আখিরাতের ধারণা পেশ করেছেন এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছেন।

৫. তিনি মানুষকে নিজের মনগড়া কোনো মতবাদের দিকে আহবান করেননি। তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি কুরআন প্রদর্শিত পথে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন।

৬. যারা তাঁর আহবান মেনে নেয়, তিনি তাঁদের জামাতবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ করেন এবং তাদেরকে দীনের শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেন।

৭. তিনি এবং তাঁর সাথিরা সকল প্রকার বিরোধিতা, বিরূপ আচরণ ও অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করেন, আল্লাহর পথে, আল্লাহর কাজে অটল অবিচল হয়ে থাকেন।

৮. তিনি এবং তাঁর সাথিরা সবাই মিলে জনগণকে আল্লাহর দীন কবুল করার আহবান জানাতে থাকেন। নিজেরা ইসলামের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করেন। নিজেদের সংগঠনের মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

৯. তাঁদের বিরোধিতা বাড়তে থাকে। অপরদিকে লোকেরা তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের মহোত্তম জীবনাদর্শ দেখতে পেয়ে ইসলাম কবুল করতে থাকে। দিন দিন তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১০. ফলে বাতিল সমাজের পতাকাবাহীরা তাদের প্রতি আক্রোশের মাত্রা বাড়াতেই থাকে।

১১. ইতোমধ্যে পাশ্ববর্তী ইয়াসরিবের লোকেরাও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে। তারা তাদের দেশে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং আল্লাহর রসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অঙ্গীকার করে।

১২. তাদের আহবান ও ব্যাপক সমর্থনে সাড়া দিয়ে রসূল সা. পার্শ্ববর্তী ইয়াসরিবে গিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। ফলে সে দেশের নাম হয় 'মদিনাতুর রসূল' বা 'রসূলের শহর'। জনগণের স্বতস্ফুর্ত সমর্থনে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন।

১৩. মক্কার লোকেরা মদিনায় গিয়ে রসূল সা. ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা তাঁকে নির্মূল করে দিতে চায়। কিন্তু তিনি এবং তাঁর সাথিরা ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে তাদের প্রতিহত করেন।

১৪. ক্রমশই ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিনা যুদ্ধেই মক্কা বিজয় হয়ে যায়। অতপর মানুষ বিনা বাধায় দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

১৫. এভাবেই এক সুশৃংখল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী হয়ে যায় এক আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দীন আল ইসলাম।

দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলোর সার সংক্ষেপ হলো:

- দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামের দিকে জনগণের মানসিক পরিবর্তন সাধন এবং ইসলামের পথে চলার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।
- চিন্তা মানসিকতার দিক থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে ও ইসলামের পথে চলতে প্রস্তুত হয়, তাদেরকে সংগঠিত ও জামাতবদ্ধ করা এবং ইসলামি নেতৃত্বের অধীন পরিচালিত করা।
- সংগঠিত জনশক্তিকে কুরআনের ভিত্তিতে ইসলামি জীবন যাপন করার এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ্যতা অর্জন করার জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- এই সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির মৌখিক দাওয়াত এবং বাস্তব চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সমাজ ও জাতির জনগণকে ইসলামের সত্যতা, বাস্তবতা ও কল্যাণময়তার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করা।

- অবশেষে মানসিকভাবে প্রস্তুত সমাজ ও জাতির দুর্বার সমর্থন ও প্রচন্ড চাপের মুখে একেবারে স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. ইসলামে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই

যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন, তাদের এই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রাম এক নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম কোনো পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়না।

বর্তমানে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্তি করার জন্যে ইসলামের শত্রুরা বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আরোপ করছে। তাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সমূহের কর্তৃত্ব তাদের হাতে থাকায় তারা ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলন সমূহের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় কায়দায় এ ধরণের মিথ্যাচারের বেসাতি করে চলেছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তাদের প্রচারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হচ্ছে জিয়ো-খৃস্ট ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র। এরাই জাপানে আনবিক বোমা ফেলে মানব সন্তানদের বিনাশ করেছে। এরাই ভিয়েতনামসহ বহু দেশে লাখো কোটি বনি আদমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এরাই ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তাদের বসতভূমি থেকে উৎখাত করে সন্ত্রাসী ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এরাই দিন রাত আবাসহারা মযলুম ফিলিস্তিনীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করছে। এরাই বসনিয়া হারজেগোভিনায় নিরপরাধ মুসলমানদের নির্দয়ভাবে গণহত্যা করেছে। এরাই নিরপরাধ স্বাধীনতাকামী চেচনিয়ার মুসলমানদের হত্যা করে চলেছে। এরাই পঞ্চাশ বছর ধরে স্বাধীনতাকামী নিরপরাধ কাশ্মিরী নারী পুরুষের ইজ্জত আবরু নষ্ট করে চলেছে, তাদের মযলুম রক্ত দিয়ে হোলি খেলছে। এরা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে। এরাই ইরাক ও আফগানিস্তানের নিরপরাধ মানুষকে বর্বরভাবে হত্যা করছে। এরাই মুসলমানদের স্বাধীন দেশ ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মির, মিন্দানাউ প্রভৃতি সন্ত্রাসী কায়দায় দখল করে রেখেছে।

মুসলমানদের গণহত্যা করা, মুসলমানদের স্বাধীন দেশ জবরদখল করে নেয়া, মুসলমানদের স্বাধীনতা বুলেট বোমা দিয়ে দাবিয়ে রাখা, মুসলমানদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করে দেয়া, মুসলমানদের সম্পদ লুন্ঠন করা

হলো শান্তিবাদীদের কাজ! পক্ষান্তরে এসব বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হলো সন্ত্রাসী কাজ!

এই হলো আধুনিক বিশ্বের জিয়ো-খৃষ্ট-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রকৃত চেহারা! এই কুৎসিত চেহারা দিয়েই তারা বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ ফেরি করে বেড়াচ্ছে।

স্বাধীনতা রক্ষা, হারানো ভূমি উদ্ধার এবং বৈধ স্বাধীনতা লাভের সশস্ত্র প্রচেষ্টাকে কিছুতেই সন্ত্রাসী তৎপরতা বলা যায়না। সত্যিকার মুসলমানরা কখনো আল্লাহ এবং রসূল সা. প্রদত্ত সীমা লংঘন করে না। সীমালংঘনকারীদের কাজ ইসলামের কাজ নয়। কিন্তু উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সশস্ত্র ভূমিকা নেয়া ইসলামে বৈধ। বরং অনেক ক্ষেত্রে ফরয।

তবে মযলুম প্রতিবাদী মুসলমানরাও আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করতে পারেন না। সকল ব্যাপারেই আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠনসমূহ ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন পরিচালনা করে, তাতে সশস্ত্র প্রক্রিয়ার কোনো সুযোগ নেই। সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরই কেবল তার সশস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যি সে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে, যা আমরা একটু আগে আলোচনা করে এসেছি।

* * *

(১৫)

মুসলিম জীবনে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা

১. সংগঠিত ও জামাতবদ্ধ থাকার নির্দেশ

ইসলাম আল্লাহর দীন বা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। তাই একমাত্র ইসলামই মানুষের জন্যে নির্ভুল জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ। আল্লাহ তায়ালা এই জীবনাদর্শ প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর বুকে এটিকে প্রবর্তিত ও বিজয়ী করতে এবং বিজয়ী রাখতে। আর এই কাজ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকা অনিবার্য-ফরয করে দিয়েছেন।

তাছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। জামাতবদ্ধতা স্বয়ং এক বিরাট শক্তি। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা। একতা, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমেই কোনো জাতি হতে পারে বিজয়ী, লাভ করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যদুস্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করারও কেউ থাকেনা।

অপরদিকে অসংগঠিত বিশৃংখল জাতি কোনো অবস্থাতেই উন্নতির চূড়ায় আরোহন করতে পারেনা। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানিতেই তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিশ্বের দরবারে এমন জাতির কোনো মর্যাদাই থাকেনা। এ ধরণের জাতি নিজেদের সম্মান এমনকি স্বাধীনতা পর্যন্ত হারিয়ে বসে। এমন জাতির পক্ষে নিজের অস্তিত্ব, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং জীবন-ব্যবস্থা ও জীবনাদর্শের হিফাযত করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হয়না। লাঞ্ছনা, পরাশাসন, অধপতন ও নিষ্পেষণই জুটে থাকে এ ধরণের জাতির ভাগ্যে।

কোনো জাতির কাছে যদি শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ও নিখুঁত জীবন-ব্যবস্থা বর্তমান থাকে এবং সেই জীবন-ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তবে সে জাতির জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব আরো অনেক অনেক বেশি। সংঘবদ্ধতা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই অর্জন করা যেতে পারেনা। সংগঠিত হওয়া ছাড়া সাধন করা যেতে পারেনা কোনো বিপ্লবই। সংগঠন সংঘবদ্ধতা ছাড়া কোনো আদর্শের বিজয় চিন্তা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা।

আমাদের মুসলিম উম্মাহ্ এমন একটি জাতি, যারা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত না হয়, তবে অমুসলিমদের শাসনই চলতে থাকবে তাদের উপর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা বিলীন হয়ে যাবে অমুসলিমদের মধ্যে।

মুসলিম উম্মাহ মানেই ইসলামি আদর্শের বাহক। আর ইসলামের আদর্শ কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন মুসলিমরা হবে ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত। বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে কেবল ফিতনা আর বিপর্যয়ই সৃষ্টি করবে। বিচ্ছিন্নতার সুযোগে যে কোনো পরাশক্তি মুসলমানদেরকে ফিতনা এবং গুমরাহিতে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আর বিচ্ছিন্নতার কারণে এ ধরণের ফিতনা তারা প্রতিরোধও করতে পারবেনা। ইতিহাস সাক্ষী, বিচ্ছিন্নতার যুগে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল? ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় তখনই সম্ভব, যখন ইসলামি উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে এর জন্যে চালিয়ে যাবে প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম।

এজন্যেই সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত থাকার প্রতি ইসলাম অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম মুসলমানদের বিশৃংখল ও বিচ্ছিন্ন না থেকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সেই সাথে তারা কিসের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হবে, কী উদ্দেশ্যে সংগঠিত হবে এবং ঐক্য ও সংগঠন কিভাবে অক্ষুন্ন ও মজবুত রাখবে তাও বলে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ : 'তোমরা সবাই মিলে শক্ত করে আল্লাহর রশি ধরো, দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়োনা। আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন। তিনি তোমাদের মনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কৃপায় তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে আর আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে তাঁর নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে ধরেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পারো'। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসূল সা. বলেন :

"আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। স্বয়ং আল্লাহই সেগুলোর নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন : ১. জামাতবদ্ধ থাকার, ২. নেতার কথা শুনার, ৩. নেতার আনুগত্য করার, ৪. হিজরত করার (অর্থাৎ আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করার এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করার।

আর জেনে রাখো, যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে গেলো, সে নিজের গলা থেকে খুলে ফেললো ইসলামের রশি- যতোক্ষণ না সে পুনরায় এসে শামিল হয়েছে জামাতে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে আহবান জানায় কোনো জাহেলি আচার ও মতবাদের দিকে, সে হবে জাহান্নামের জ্বালানি, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে"। -সূত্র আহমদ, তিরমিযি। বর্ণনা : হারিছ আল আশ'আরি।

উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসটি থেকে পরিষ্কার হলো :

১. মুসলিমদের অবশ্যই সংগঠিত ও জামাতবদ্ধ থাকতে হবে।

২. কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলিম সংগঠন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

৩. সংগঠন থেকে মুক্ত হওয়া মানেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া।

৪. মুসলমানদের সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

৫. নেতৃত্বের আনুগত্য করতে হবে।

৬. সংগঠন ছাড়া সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়।

৭. দলাদলি, বিশৃংখলা ও বিচ্ছিন্নতা মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ।

৮. ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাবলুল্লাহ- আল্লাহর রশি'। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও সুন্নতে রসূলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দুটির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এই ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। সবাই পরস্পরকে এই দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহযোগিতা করবে।

২. সংগঠন ও জামাতবদ্ধতার উদ্দেশ্য

সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের কোন্ কাজটি করতে হবে? কী উদ্দেশ্যে সংগঠিত হবে মুসলমান? সংগঠিত ও জামাতবদ্ধ হবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই বলে দিয়েছেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে আর পাপ ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। যারা এ কাজ করবে, তারাই সাফল্য অর্জন করবে।' -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৪।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

অর্থ : 'আর এভাবে আমি তোমাদের বানিয়েছি একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ (দল), যাতে করে তোমরা বিশ্ব মানবের সামনে ইসলামের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। আর আমার রসূল যেনো হয় তোমাদের জন্যে সাক্ষী (ইসলামের মডেল)।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৪৩।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ : 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মাহ (দল)। তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবজাতির পথ প্রদর্শন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে। তোমরা মানুষকে সত্য-ন্যায়ের আদেশ দেবে আর অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্র প্রতি থাকবে অবিচল আস্থাশীল।' -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১১০।

এ আয়াতগুলো থেকে মুসলিমদের সংগঠিত ও জামাতবদ্ধ হবার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে জানা গেলো। সে উদ্দেশ্য হলো :

১. মানুষকে তাদের কল্যাণ ও মংগলের দিকে আহবান করা।

২. মানুষের সামনে ইসলামের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়ানো এবং ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখানো।

৩. মানুষ ও মানব সমাজের সংস্কার সংশোধন করা।

৪. মানুষকে সত্য-ন্যায়ের আদেশ করা।

৫. মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত রাখা।

৬. রসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং

৭. উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা।

৩. নেতৃত্বের আনুগত্য

এ যাবতকার আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো, বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত থাকা মুসলমানদের কাজ নয়। এটা দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলমানদের জন্যে ভয়াবহ অশুভ পরিণতি ডেকে আনে। মূলত সুসংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত থাকাই মুসলমানদের কাজ। আর সংগঠনকে পরিচালনার জন্যে থাকতে হবে নেতৃত্ব। কারণ উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও আদর্শ এবং নেতৃত্ব ও কর্মসূচি ছাড়া সংগঠন হয়না। আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত সীমার মধ্যে নেতার আনুগত্য করা ঠিক সে রকম অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা। অবশ্য মতপার্থক্য দেখা দিলে নেতৃত্ব ও পরিচালিত সকলকেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের অকাট্য ঘোষণা হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: 'হে ঈমানদার লোকেরা! আনুগত্য করো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আর সেইসব লোকদেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বশীল। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তখন ব্যাপারটা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি আর পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।' -সূরা আন নিসা : আয়াত ৫৯।

এ প্রসঙ্গে রসূলে আকরাম সা. বলেছেন:

"যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো। যে আমার হুকুম অমান্য করলো, সে মূলত আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করলো। যে আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো। আর যে আমীরকে অমান্য করলো সে আমাকে অমান্য করলো। নেতা হলো ঢালস্বরূপ। তার সংগে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং (বিপদ থেকে) রক্ষা পাওয়া যায়। -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

হাদিসটি থেকে পরিষ্কার হলো, ইসলামি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আনুগত্য করা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করারই সমতুল্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ও রসূলের অনুসারী থাকা সত্ত্বেও নেতাকে অমান্য করা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলকে অমান্য করারই সমতুল্য। তাছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যেও নেতা ও নেতার আনুগত্য অপরিহার্য। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের মাধ্যমেই

মুসলিম উম্মাহ্ যাবতীয় বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

"মুমিন ব্যক্তির জন্যে (আমীরের) কথা শুনা ও মানা অপরিহার্য, যেসব কথা পছন্দ হয় সেগুলোও, আর যেসব কথা পছন্দ হয়না সেগুলোও, যতোক্ষণ তিনি আল্লাহ ও রসূলের বিধানের খেলাফ কোনো হুকুম না দেবেন। অবশ্য যখনই তিনি আল্লাহ ও রসূলের বিধানের খেলাফ কোনো হুকুম দেবেন, তা শুনাও যাবেনা, মানাও যাবেনা।" -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

অপর একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেন :

"নেতার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তখন আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচার মতো কোনো যুক্তি-প্রমাণ তার থাকবেনা। আর সংগঠন ও ইমারতের নিকট বাইয়াত ছাড়া যে ব্যক্তির মৃত্যু হলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। " -সহীহ মুসলিম।

হাদিস থেকে প্রমাণ হলো, সংগঠন ও নেতৃত্বের আনুগত্যবিহীন জীবন সত্যিকার ইসলামি জীবন নয়।

৪. মজবুত অটুট সংগঠন

ঈমানের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলে মজবুত ও অটুট সংগঠন নির্মাণ করা মুসলিমদের জন্যে অপরিহার্য। মুসলমানদের সংগঠন কতোটা মজবুত ও সংহতি পূর্ণ হতে হবে, তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার হয় :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে।' -সূরা ৬১ আস্সফ : আয়াত ৪।

আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করা এবং বিজয়ী রাখার চেষ্টা সংগ্রাম করা মুসলমানদের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই তাদের জন্যে ঐক্য সংহতি, ও মজবুত সংগঠন অপরিহার্য। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"মুমিন মুমিনের জন্যে প্রাচীরের মতো, যার একটি অংশ আরেকটিকে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করে।' একথা বলে নবী করিম সা. এক হাতের সবগুলো আংগুল আরেক হাতের আংগুলের ফাঁকে রেখে মজবুত করে দেখালেন।" -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

আধুনিক বিশ্বে অটুট ইসলামি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যে প্রজ্ঞাবান মনীষী, তিনি হলেন আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। তাঁর মতে, চারটি ব্যক্তিগত এবং চারটি সামষ্টিক মোট আটটি মৌলিক শর্ত পূরণের মাধ্যমেই মজবুত ও অটুট হতে

পারে ইসলামি সংগঠন। সংগঠনের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে নিম্নোক্ত চারটি মৌলিক গুণ অবশ্যি থাকতে হবে :

১. তাকে ইসলামের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২. ইসলামের প্রতি তার অটুট ও অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে।

৩. তার চরিত্র ও কর্ম হতে হবে ইসলামের কাংখিত মানের।

৪. ইসলাম এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাই হবে তার জীবনের উদ্দেশ্য।

আর সমষ্টিগতভাবে সংগঠনের ব্যক্তিদের মধ্যে থাকতে হবে :

১. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা।

২. পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি।

৩. আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

৪. মোহাসাবা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার পদ্ধতি।

* * *

১৬

অধিকার ও কর্তব্য

মানুষের উপর মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র উপর মানুষের অধিকার রয়েছে। আবার বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন মানুষের উপর বিভিন্ন মানুষের অনেক অধিকার বর্তায়। এসব অধিকার প্রদান করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। একের অধিকার অপরের কর্তব্য।

১. মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে প্রতিপালন করেন। তিনিই সরবরাহ করেন মানুষের জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ। তাই মানুষের উপর রয়েছে তাঁর অনেক অধিকার।

১. মানুষ শুধু তাঁকেই নিজের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, শাসক, হুকুমকর্তা, ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসেবে মেনে নেবে। সে শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করবে। সে তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করবেনা।
২. মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে যে দীন বা জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, মানুষ সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। সে মনগড়া বা মানুষের তৈরি করা পথে চলবেনা।
৩. আল্লাহ মানুষের জন্যে যা কিছু হালাল করেছেন, সেগুলোকে সে হালাল হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ যা কিছু তার জন্যে হারাম করেছেন, সেগুলো সে বর্জন করবে এবং সব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে। কুরআন সুন্নাহকেই যাবতীয় গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড বানাবে।
৪. সে আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসবে। আল্লাহ্‌র জন্যে সবকিছু কুরবানি করতে প্রস্তুত থাকবে।
৫. সে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবেনা। আল্লাহর হুকুম কার্যকর করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

২. আল্লাহর উপর মানুষের অধিকার

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র যে অধিকার রয়েছে, মানুষ যদি সে অধিকার সঠিকভাবে আদায় করে, তবে আল্লাহ্‌র উপর মানুষের এই অধিকার বর্তায় যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তাকে শাস্তি দেবেন না। তিনি তাকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দান করবেন।

৩. নিজের দেহ ও মনের অধিকার

প্রত্যেক মানুষের উপর তার নিজের দেহ ও মনের অধিকার রয়েছে। মানুষের উপর তার শরীরের অধিকার হলো, সে শরীরকে সুস্থ রাখবে, পবিত্র রাখবে। প্রয়োজনীয় পানাহার করবে। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করবে। শরীরকে সক্রিয় ও কর্মতৎপর রাখবে এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেবে।

মানুষের উপর তার মনের অধিকার হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে সে মনের দাবিসমূহ পূরণ করবে এবং মনকে প্রশান্তি দেবে। মহান আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্তি লাভ করে।

৪. মানুষের উপর মানুষের সাধারণ অধিকার

ইসলামি শরিয়ত মানুষের উপর মানুষের বিরাট অধিকার বর্তিয়েছে। সাধারণভাবে প্রতিটি মানুষের উপর আরেকজন মানুষের অধিকার হলো :

০১. কেউ কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবেনা।
০২. কেউ কাউকেও হত্যা করবেনা।
০৩. কেউ কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার করবেনা।
০৪. কেউ কাউকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেনা, সম্মানহানি করবেনা।
০৫. কাউকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেবেনা।
০৬. কাউকেও ঘৃণা করবেনা, তুচ্ছ জ্ঞান করবেনা।
০৭. কারো বাক স্বাধীনতা হরণ করবেনা।
০৮. প্রত্যেকের বৈধ অধিকারসমূহ প্রদান করবে, কখনো কারো বৈধ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবেনা।
০৯. মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার হরণ করবেনা।
১০. অকারণে কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেনা।
১১. কারো অর্থ সম্পদ ও আয় রোজগারের ক্ষতি সাধন করবেনা।
১২. কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবেনা।
১৩. কারো প্রতি অবিচার করবেনা।
১৪. মানবিক সেবা ও সাহায্য সহযোগিতা করে যাবে।
১৫. বিপদ-আপদে সাধ্যানুযায়ী তার পাশে দাঁড়াবে, তার উপকার করবে।
১৬. সব মানুষের প্রতি মানবিক দয়া ও মানবোচিত আচরণ করবে।
১৭. কারো নিন্দা করবেনা।
১৮. সব মানুষের কল্যাণ-কামনা করবে।

৫. মাতা পিতার অধিকার

মাতা-পিতাই সন্তানকে স্নেহ-মমতা, আদর যত্ন এবং বহু দু:খ কষ্ট ভোগ করে লালন-পালন করেন। সেজন্যে স্রষ্টার পরেই মানুষের উপর পিতা-মাতার অধিকার বর্তায়। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ : 'তোমাদের প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন: তোমরা শুধুমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত, আনুগত্য ও দাসত্ব করবেনা। আর পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে।' -সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল আয়াত : ২৩।

সন্তানের উপর পিতা মাতার অধিকার হলো, তারা :

১. সব সময় পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।
২. কখনো তাঁদের সাথে মন্দ ব্যবহার করবেনা।
৩. তাঁদের মনে কষ্ট দেবেনা। তাঁদের প্রতি উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করবেনা।
৪. আন্তরিকভাবে তাদের সেবা করবে।
৫. তাঁরা বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়লে সেবা যত্ন এবং ভরণ পোষণসহ তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।
৬. তাঁদের হুকুম পালন করবে।
৭. তাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীত কোনো হুকুম দিলে মানবেনা, তবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেই যাবে।
৮. সব সময় তাঁদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করবে।
৯. তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেনা।
১০. সব সময় তাদের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে।

৬. সন্তানদের অধিকার

পিতা-মাতার উপরও সন্তানের অনেক অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি অধিকার হলো :

০১. তারা সন্তানকে হত্যা করবেন না।
০২. জন্মের পর শিশু সন্তানের কানে আযান দেবেন।
০৩. তাদের জন্যে আকীকা করবেন এবং ভালো নাম রাখবেন।
০৪. তাদের খাতনার ব্যবস্থা করবেন।
০৫. মা বুকের দুধ পান করাবেন।
০৬. তাঁরা সন্তানকে ভালোবাসবেন, স্নেহ করবেন।
০৭. সন্তানকে সযত্নে লালন পালন করবেন।

০৮. সন্তানদের সুশিক্ষা দান করবেন, তাদের বিবেকবোধ ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করে তুলবেন।
০৯. তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করবেন।
১০. তাদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলবেন। তাদেরকে ভদ্রতা, নম্রতা, সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন।
১১. তাদেরকে মানুষের সেবা করার, বড়দের সম্মান করার এবং ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেবেন।
১২. তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবেন।
১৩. তাদেরকে স্বাবলম্বী হবার যোগ্য করে গড়ে তুলবেন।
১৪. ছেলে এবং মেয়ে সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দেবেন।
১৫. সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবেন।

৭. স্বামীর অধিকার

আল্লাহ পাক স্ত্রীর উপর স্বামীর কতগুলো অধিকার বর্তিয়েছেন। সেইসব অধিকার আদায় করা স্ত্রীর কর্তব্য। স্ত্রীর উপর স্বামীর কয়েকটি অধিকার হলো:

০১. স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। স্বামীর অবাধ্য হবে না। স্বামীর সকল বৈধ হুকুম পালন করবে।
০২. স্ত্রী হিসেবে নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে।
০৩. স্বামীর কথা, কাজ ও সম্পদের গোপনীয়তা ও আমানত রক্ষা করবে।
০৪. স্বামীর অর্থ সম্পদের হিফাযত করবে।
০৫. স্বামীর সেবা করবে।
০৬. সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর ন্যায্য দাবি পূরণ করবে।
০৭. স্বামীর সংসারে পরিচালিকার দায়িত্ব পালন করবে।
০৮. কখনো কোনো ব্যাপারে স্বামীর খিয়ানত করবে না।
০৯. স্বামীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।
১০. সাধ্যানুযায়ী স্বামীর সাহায্য সহযোগিতা করবে।
১১. বিপদ মুসিবতে স্বামীকে সান্ত্বনা দেবে এবং স্বামীর পাশে দাঁড়াবে।
১২. গুরু দায়িত্ব পালনে স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করবে।
১৩. স্বামীর অভাব অনটনে ধৈর্যধারণ করবে।
১৪. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধা করবে এবং মেহমানদারি করবে।
১৫. সকল বৈধ পন্থায় স্বামীকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে।

৮. স্ত্রীর অধিকার

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূল সা. স্বামীর উপর স্ত্রীর অনেকগুলো অধিকার ধার্য করে দিয়েছেন। সেগুলো হলো : স্বামী-

০১. স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করবে।
০২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে।
০৩. স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে।
০৪. স্ত্রীর যাবতীয় আমানত রক্ষা করবে।
০৫. স্ত্রীর যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করবে।
০৬. কখনো স্ত্রীর কোনো আমানতের খিয়ানত করবে না।
০৭. সংসার ব্যবস্থাপনায় স্ত্রীর সহযোগিতা করবে।
০৮. স্ত্রীর সাথে সৎ জীবনযাপন করবে।
০৯. স্ত্রীকে দীনের জ্ঞানার্জনে সহযোগিতা করবে।
১০. স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ হলে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।
১১. সাধ্যনুযায়ী স্ত্রীর সকল বৈধ দাবি পূরণ করবে এবং সকল বৈধ অধিকার প্রদান করবে।
১২. স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় উপদেশ-নসিহত প্রদান করবে।
১৩. স্ত্রীর সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ আদান-প্রদান করবে।
১৪. স্ত্রীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান করবে।
১৫. সকল বৈধ পন্থায় স্ত্রীকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে।

৯. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

মানুষের কয়েক ধরনের আত্মীয়-স্বজন থাকে। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজন। আত্মীয়দের রয়েছে অনেক অধিকার। যেমন :

০১. রক্ত সম্পর্ক অটুট রাখা। রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করা।
০২. উত্তরাধিকার প্রদান করা।
০৩. তাদের মেহমানদারি করা।
০৪. তাদের খোঁজ-খবর নেয়া।
০৫. তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।
০৬. তাদের সেবা-যত্ন করা।
০৭. তাদের সাথে মিল-মহব্বত বজায় রাখা।
০৮. তাদের আমানত রক্ষা করা।
০৯. তাদের মান ইজ্জত রক্ষা করা।
১০. বিপদে আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো।
১১. তাদের আনন্দে-উৎসবে যোগদান করা।
১২. দুঃখ ও শোকে তাদের সান্ত্বনা দেয়া।

১০. প্রতিবেশীর অধিকার

কুরআন মজিদে এবং হাদিসে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সব মানুষের তুলনায় প্রতিবেশীর অধিকার অনেক বেশি। ইসলাম একজন প্রতিবেশীর উপর আরেকজন প্রতিবেশীর এসব অধিকার ধার্য করে দিয়েছে :

০১. প্রতিবেশীর সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করা।
০২. প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া।
০৩. প্রতিবেশীর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করা।
০৪. প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী হওয়া এবং সুখে খুশি হওয়া।
০৫. প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা।
০৬. তাদের প্রয়োজনে ধার কর্জ প্রদান করা।
০৭. তারা অভুক্ত থাকলে খাবার ব্যবস্থা করা।
০৮. প্রতিবেশীর সন্তানদের স্নেহ-মমতা করা।
০৯. হাদিয়া তোহফা দেয়া। ভালো রান্না করলে তাদের জন্যেও কিছু পাঠানো।
১০. বিপদের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো।
১১. অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
১২. তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
১৩. তাদের সাথে শত্রুতা না করা।
১৪. তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা।
১৫. তাদের কল্যাণ কামনা করা।

দূরের প্রতিবেশীর চাইতে নিকটের প্রতিবেশীর অধিকার বেশি।

১১. গরীব দুঃখীর অধিকার

গোটা মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। অর্থ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি কাউকেও বেশি আবার কাউকেও কম অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকেন। তাই সমাজে কিছু লোকের অর্থ-সম্পদ থাকে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি। আবার কিছু লোকের যা অর্থ সম্পদ থাকে, তা দিয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এইসব লোক দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করে।

আল্লাহ পাক যাদেরকে প্রয়োজনের চাইতে বেশি অর্থ সম্পদ দিয়েছেন, কিংবা ভালোভাবে চলার মতো অর্থ সম্পদ দিয়েছেন, তারাই ধনী বা সামর্থবান। ধনীদের অর্থ সম্পদে গরীব-দুঃখীদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ : "তাদের (ধনীদের) অর্থ-সম্পদে পরমুখাপেক্ষী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।" -সূরা ৫১ আয্ যারিয়াত : আয়াত ১৯।

যাকাত প্রদান এবং সাধারণভাবে দান করার মাধ্যমে গরীব-দুঃখীদের এই অধিকার প্রদান করা ধনীদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

গরীব দুঃখীরা হাত পাতলে তাদের অধিকার দিতে হবে। তারা হাত না পাতলেও খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে। তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. মুসলমানদের উপর মুসলমানদের বিশেষ অধিকার

উপরে বর্ণিত সমস্ত অধিকার ছাড়াও এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে। সেগুলো হলো :

০১. ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা।
০২. সাক্ষাত হলে সালাম দেয়া।
০৩. দাওয়াত দিলে কবুল করা
০৪. পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দেয়া।
০৫. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ; বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
০৬. কখনো অপমানিত ও অপদস্ত না করা।
০৭. কখনো গীবত না করা।
০৮. আক্রান্ত হলে সাহায্যের হাত বাড়ানো।
০৯. রোগগ্রস্ত হলে সেবা-চিকিৎসা করা।
১০. মৃত্যু হলে দাফন-কাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা।

১৩. জীব-জন্তুর অধিকার

মানুষের উপর গৃহপালিত এবং অন্যান্য জীব-জন্তুরও অধিকার রয়েছে। রসূল সা. বলেছেন, জোয়ান ও শক্তিশালী থাকার সময় যে পশুটিকে তুমি সোয়ারি, মালামাল পরিবহন এবং চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করেছো, সেটি বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়লে তার প্রতি অযত্ন করো না।

যেহেতু পশুটি তার জীবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ তার মনিবের কাজে নিঃশেষ করেছে, তাই বৃদ্ধ এবং অক্ষম অবস্থায়ও মনিবের নিকট থেকে পূর্বের ন্যায় সমান সেবা-যত্ন পাবার অধিকার তার রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যেসব পশু-পাখির গোশত হালাল করেছেন, সেগুলোকে যবেহ্ করার সময় যতোটা সম্ভব আসানের সাথে যবেহ করা কর্তব্য। প্রিয় নবী সা. এজন্যে যবেহর পূর্বে ছুরি ধার দিয়ে নিতে বলেছেন। এটা ওদের অধিকার।

গৃহপালিত পশু-পাখির মনিবের পক্ষ থেকে যথাযথ খাদ্য ও সেবা-যত্ন পাবার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে কষ্ট দেয়া নিষেধ।

ক্ষতিকারক জীব-জন্তু ছাড়া বিনা কারণে জীব-জন্তু হত্যা করা নিষেধ।

এ যাবত যেসব হক বা অধিকারের কথা বর্ণনা করা হলো, এসব অধিকার স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব অধিকারের কথা আল কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। এই সকল অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা এবং সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। একের অধিকার অপরের কর্তব্য।

* * *

(১৭)

চরিত্র ও আচার ব্যবহার

১. চরিত্র কী?

কোনো ব্যক্তির জীবন-যাপনের পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ এবং তার আচার আচরণই তার চরিত্র।

মানুষের কথা-বার্তা, লেনদেন, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তার চরিত্র প্রকাশ পায়। চরিত্র দুই প্রকার : ১. উত্তম বা সৎ চরিত্র এবং ২. মন্দ বা অসৎ চরিত্র।

উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে বলা হয় চরিত্রবান ও নীতিবান। আর মন্দ চরিত্রের ব্যক্তিকে বলা হয়- চরিত্রহীন ও নীতিহীন। মন্দ চরিত্রের মানুষ পশুর তুল্য।

২. মন্দ চরিত্র কী?

বাবুল মেম্বারকে সবাই জানে। সে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা খেলাফ করে, ঘুষ খায়, মানুষকে ধোকা দেয়, প্রতারণা করে, অন্যায়ের পক্ষ নেয়, স্বজন-প্রীতি দেখায়, যুলুম করে, মানুষকে গালি-গালাজ করে, অশ্লীল কাজ করে। এই বাবুল মেম্বার একজন চরিত্রহীন মানুষ। মানুষ তাকে অসৎ ও মন্দ লোক বলেই জানে।

কালু বেপারী একজন ব্যবসায়ী। সে ভালো মালের সাথে ভেজাল মিশায়, মাপে কম দেয়, গেরস্তের নিকট থেকে কিনে নেবার সময় মাপে বেশি নেয়, লেনদেনে হেরফের করে, ধোকা দেয়, প্রতারণা করে, খারাপ জিনিসকে ভালো জিনিস বলে চালায়, মিথ্যা কসম খায়, সুদী কারবার করে। কালু বেপারী একজন অসৎ ও চরিত্রহীন লোক।

বেল্টু শেখ সামাজিক নেতা। সে সবার কাছেই মন্দ ও অসৎ চরিত্রের লোক বলে পরিচিত। কারণ সবাই জানে, সে মিথ্যা কথা বলে। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক সবই করে। বদমায়েশি করে। গালি-গালাজ করে, পরনিন্দা করে। মানুষের ক্ষতি করে, ষড়যন্ত্র করে, ধোকা দেয়। আইল ঠেলে, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে। বাকি কিনে দাম দেয়না। জালিয়াতি করে। মুখে এক রকম বলে কাজে আরেক রকম করে। মদ খায়, তাড়ি খায়, ফেন্সিডিল খায়, অশ্লীল কাজ করে, লাজ-লজ্জার ধার ধারেনা।

বড়দের সম্মান করেনা, ছোটদের স্নেহ করেনা, বাবা-মার সাথে দুর্ব্যবহার করে, শিক্ষকদের সাথে বেয়াদবি করে। ভালো লোকদের বিদ্রুপ করে, খারাপ লোকদের সাথে চলাফেরা করে, আড্ডা দেয়, আত্মসাৎ করে। হ্যাঁ এই বেল্টু শেখ চরম চরিত্রহীন লোক।

মালতী বেগম একজন গৃহবধূ। তার ব্যবহারে মানুষ অতিষ্ঠ। সে সুযোগ পেলেই পরের জিনিসে হাত দেয়। কথায় কথায় গালি-গালাজ করে। প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-ঝাটি করে। শাশুড়ীর সাথেও বিবাদ করে, স্বামীর অবাধ্য হয়ে চলে। লাজ-লজ্জার ধার ধারেনা। মানুষকে খোটা দেয়, পরনিন্দা করে। কারো ভালো দেখতে পারেনা, হিংসা করে। কথায়-কাজে আত্মীয় স্বজনকে কষ্ট দেয়। প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তার মন্দ কথা এবং মন্দ আচরণ থেকে কেউই রক্ষা পায়না। এই মালতী বেগম একজন চরিত্রহীন নারী।

বাবুল মেম্বার, কালু বেপারী, বেল্টু শেখ এবং মালতী বেগম এরা সবাই মন্দ চরিত্রের লোক। এদের আচার-ব্যবহার খারাপ।

এদের মধ্যে যেসব মন্দ অভ্যাস ও আচার ব্যবহার রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেগুলোকে খুবই অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন। সকল বিবেকবান মানুষের কাছেই এগুলো নিন্দনীয়। আল্লাহর, আল্লাহর রসূলের আর সকল মানুষের অভিশাপ এদের প্রতি বর্ষিত হয়।

তাই এ ধরণের কথা-বার্তা, চাল-চলন ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই কর্তব্য।

৩. উত্তম চরিত্র কী?

খাদিজা একজন গৃহবধূ। তিনি একজন বিবেকবান মহিলা। তিনি আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেন। তিনি সব সময় সত্য কথা বলেন। সকল ভালো কাজে স্বামীর আনুগত্য করেন। স্বামীর সেবা করেন। শশুর-শাশুড়ীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাদের বিপদে দুঃখিত হন, তাদের খুশিতে আনন্দিত হন। বিপদে-আপদে ধার-কর্জ দেন। সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলেন। স্বামীর আমানত রক্ষা করেন। মন্দ কাজ ঘৃণা করেন। মানুষকে সৎ পরামর্শ ও উপদেশ দেন। এই খাদিজা একজন উত্তম চরিত্রের সতী সাধ্বী মহিয়সী মহিলা। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, মানুষও তাকে ভালোবাসে। সবাই তার জন্যে দু'আ করে।

উসমান বেপারী একজন ব্যবসায়ী। তিনি কখনো মাপ-জোপে হেরফের করেন না। মন্দ জিনিসকে ভালো বলে প্রতারণা করেন না। ভেজাল মিশিয়ে ধোকা দেননা। সঠিক মাপ দেন, সত্য কথা বলেন। আমানতের খিয়ানত করেন না। লেনদেনে গড়িমসি করেন না। লোকসান হলেও সততা বজায় রাখেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যবসায়ী। মানুষ তাকে বিশ্বাসী মনে করে।

সালমান একজন ছাত্র। সে পড়ালেখায় খুবই মনোযোগী। সে সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলে, সত্য কথা বলে, ওয়াদা রক্ষা করে। রীতিমতো নামায-রোযা করে। কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করে না। মন্দ ছেলেদের সাথে চলে না। কখনো মন্দ কথা বলে না, মিথ্যা কথা বলে না, কাউকেও গালি দেয় না। সে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে না, ওয়াদা খেলাফ করে না। কারো নিন্দা করে না, কারো হক নষ্ট করে না, কারো জিনিসে হাত দেয় না। মানুষের সেবা করে, উপকার করে। ন্যায় কাজে সহযোগিতা করে, অন্যায় কাজে বাধা দেয়। বড়দের সম্মান করে। ছোটদের স্নেহ করে। এই সালমান একজন চরিত্রবান ছেলে। সবাই তাকে ভালোবাসে।

৪. উত্তম চরিত্র ও ভালো ব্যবহারের গুরুত্ব

উত্তম চরিত্র ও ভালো ব্যবহার মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ দ্বারা মানুষ দুনিয়াকে জয় করতে পারে। এর দ্বারা সে আখিরাতেও অর্জন করবে সাফল্য। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. উত্তম চরিত্র ও ভালো ব্যবহারের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

১. 'তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।'

২. 'তোমরা সহজ-সরলভাবে কথা বলো।'

৩. 'মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।'

৪. 'আল্লাহ সত্যবাদীদের ভালোবাসেন।'

৫. 'আল্লাহ সুবিচারকদের ভালোবাসেন।'

৬. 'আল্লাহ উপকারীদের ভালোবাসেন।'

রসূল সা. বলেছেন :

১. 'মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ উত্তম চরিত্র।'

২. 'বাবা-মা সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চাইতে ভালো কিছু দান করতে পারে না।'

৩. 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

যারা সত্যিকার মুসলিম তাদের চরিত্র হতে হয় ভালো। যার চরিত্র ভালো তাকে বলা হয় চরিত্রবান। যারা মন্দ লোক তাদের চরিত্র হয় খারাপ। তাদেরকে বলা

হয় চরিত্রহীন। কথা, কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ভালো ও মন্দ চরিত্র প্রকাশ পায়।

যে নিজের কথা, কাজ ও ব্যবহারকে ভালো বানাতে পারে, সেই চরিত্রবান। একজন মুসলমানকে অবশ্যি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং মন্দ কথা, কাজ ও ব্যবহার বাদ দিতে হবে।

উত্তম চরিত্র	মন্দ চরিত্র
১. সত্য কথা বলা	১. মিথ্যা কথা বলা
২. ন্যায় কথা বলা	২. অন্যায় কথা বলা
৩. ওয়াদা রক্ষা করা	৩. ওয়াদা খেলাপ করা
৪. ভালো কথা বলা	৪. মন্দ কথা বলা
৫. বড়দের সম্মান করা	৫. বড়দের অসম্মান করা
৬. স্নেহ, মমতা, দয়া	৬. নির্দয় ও নিষ্ঠুরতা
৭. আমানত রক্ষা করা	৭. আমানতের খিয়ানত করা
৮. মানুষের উপকার করা	৮. মানুষের ক্ষতি করা
৯. মানবিকতা	৯. অমানবিকতা
১০. শালীনতা, শিষ্টতা	১০. অশালীনতা, অশিষ্টতা
১১. লজ্জাশীলতা	১১. নির্লজ্জতা
১২. ভালো ব্যবহার করা	১২. খারাপ ব্যবহার করা
১৩. নীতি ঠিক রাখা	১৩. নীতি বিসর্জন দেয়া
১৪. মানুষের কল্যাণ কামনা করা	১৪. মানুষের মন্দ কামনা করা
১৫. পবিত্র জীবন যাপন	১৫. নোংরা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া
১৬. সৎ জীবন যাপন করা	১৬. অসৎ জীবন যাপন করা
১৭. ন্যায়, বৈধ ও সৎ উপায়ে উপার্জন করা	১৭. চুরি, ডাকাতি ও ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করা
১৮. ভদ্র আচরণ করা	১৮. অভদ্র আচরণ করা
১৯. উদারতা	১৯. হিংসা-বিদ্বেষ
২০. কৃতজ্ঞতা	২০. অকৃতজ্ঞতা
২১. নিঃস্বার্থপরতা	২১. স্বার্থপরতা
২২. সুশৃংখল জীবন যাপন	২২. উশৃংখল জীবন যাপন

৫. উপার্জন

বেঁচে থাকা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপার্জন করতে হয়। তবে মুমিনদেরকে অবশ্যি হালাল উপার্জন করতে হবে।

হালাল উপার্জন মানে- বৈধ ও ন্যায্য উপায়ে অর্থ সম্পদ আয় করা।

একজন মুসলমানের জন্যে হালাল উপার্জন করা ফরয। মুসলমানের জন্যে সুদের উপার্জন হারাম, ঘুষের উপার্জন হারাম। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। ঠকবাজি ও ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। জুয়া ও জালিয়াতির মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। পরের হক আত্মসাতের কামাই হারাম। এভাবে সকল প্রকার অন্যায়, অবৈধ ও যুলুমের উপার্জন হারাম। এমনকি সক্ষম লোকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির উপার্জনও হারাম।

মুসলমানের জন্যে হালাল উপার্জনের পথ হলো:

১. বৈধ উপায়ে হালাল ব্যবসা করা।
২.শ্রমদানের মাধ্যমে উপার্জন করা।
৩.চাকুরি করার মাধ্যমে উপার্জন করা।

হারাম উপার্জনকারী দুনিয়ায় অসৎ এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। হালাল উপার্জনকারী দুনিয়ায় সৎ মানুষ এবং আখিরাতে সফল ও সৌভাগ্যবান।

৬. খরচ

একজন মুসলিম যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেন, তা হালাল পথে খরচ করা অবশ্য কর্তব্য। হারাম পথে খরচ করলে সে জন্যে পরকালে কঠিন শাস্তি হবে। হালাল পথের খরচ হলো :

১. নিজের প্রয়োজনে খরচ করা।
২. সন্তানের জন্যে খরচ করা।
৩. স্ত্রীর জন্যে খরচ করা।
৪. পিতামাতার জন্যে খরচ করা।
৫. আত্মীয় স্বজনের জন্যে খরচ করা।
৬. আল্লাহর পথে খরচ করা।
৭. গরীব দুঃখীর জন্যে খরচ করা এবং
৮. অন্যান্য বৈধ কাজে খরচ করা।

হালাল পথে উপার্জন করা এবং হালাল পথে খরচ করা দুটোই নেকীর কাজ। আর খরচের ক্ষেত্রে নিষেধ হলো :

১. হারাম কাজে খরচ করা।
২. খরচের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা।
৩. অপচয় করা, অপব্যয় করা।
৪. কৃপণতা করা। প্রয়োজনে খরচ না করা।

৫. লোক দেখানোর জন্যে, কিংবা প্রশংসা পাওয়ার জন্যে দান করা।

হারাম পথে উপার্জন করা এবং হারাম পথে খরচ করা দুটোই গুনাহের কাজ।

একটি হাদিসে প্রিয় রসূল সা. বলেন :

"কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবার আগ পর্যন্ত মানব সন্তানের পা এক কদমও নড়বে না। সেগুলো হলো :

১. সে নিজের জীবন কোন্ পথে পরিচালিত করেছে?
২ যৌবনের শক্তি সামর্থ কী কাজে লাগিয়েছে?
৩. অর্থ-সম্পদ কোন্ পথে উপার্জন করেছে?
৪. অর্থ-সম্পদ কোন্ পথে খরচ করেছে?
৫. যতোটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতোটুকু চলেছে? -সূত্রঃ তিরমিযিঃ বর্ণনা-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.।

ফলে সম্পদ উপার্জন এবং খরচ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিনকেই সতর্ক হওয়া উচিত। প্রত্যেকেরই উপার্জন ও খরচের ক্ষেত্রে হালাল পথ অবলম্বন এবং হারাম পথ ত্যাগ করা উচিত।

* * *

১৮

আখিরাতের জীবন

১. আখিরাত কী?

কুরআন-হাদিসে আখিরাত এবং বেহেশত ও দোযখের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

মানুষের জীবনে আখিরাতের জীবনটাই আসল। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা একেবারেই তুচ্ছ। যেমন মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি একেবারেই তুচ্ছ।

এক ফোটা পানি মহাসমুদ্রের কতো ভাগের এক ভাগ এটা যেমন কারো পক্ষে হিসাব করে বের করা সম্ভব নয়, তেমনি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা কতো ভাগের এক ভাগ তাও কারো পক্ষে হিসাব করে বের করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা একেবারেই তুচ্ছ নগণ্য।

আখিরাত মানে- মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। মানুষের মৃত্যুর পর থেকেই তার আখিরাত শুরু হয়ে যায়। আখেরাতের কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। মৃত্যু পর সে অধ্যায়গুলো মানুষের জীবনে একটির পর আরেকটি আসে। অধ্যায়গুলো হলো : ১. মৃত্যু ২. আলমে বরযখ ৩. কিয়ামত ৪. হাশর ও বিচার ৫. জান্নাত বা জাহান্নাম।

২. মৃত্যু

পার্থিব জীবন থেকে পরকালীন জীবনে পা বাড়াবার মাধ্যম হলো মৃত্যু। মৃত্যুই মানুষকে পরকালের দিকে টেনে নিয়ে যায়। দুনিয়ার জীবন কেউ ধরে রাখতে পারে না। মরণকে বরণ করতেই হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

অর্থ : 'প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।' -সূরা ২৯ আন কাবুত : ৫৭।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

অর্থ : 'হে নবী, এদের বলে দাও: যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো সে তোমাদের নাগাল পাবেই।' -সূরা ৬২ জুমু'আ : আয়াত ৮।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থ: ‘তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। যতো মজবুত কিল্লার মধ্যেই তোমরা অবস্থান করো না কেন।’ -সূরা নিসা : ৭৮।

অতপর কুরআন আরো বলেছে যে, মৃত্যু কোনো ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী, তার সুবিধে মতো সময় এবং পছন্দনীয় স্থানে আসবে না। বরঞ্চ তা আসবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই নির্ধারিত সময় ও স্থানে :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থ : ‘কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময়টাতো নির্দিষ্টভাবে লিখিতই রয়েছে।’ -সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৪৫।

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

অর্থ : ‘কোনো প্রাণীই জানে না কোথায় এবং কিভাবে তার মৃত্যু হবে।’ -সূরা ৩১ লুকমান : আয়াত ৩৪।

৩. আলমে বরযখ

আলম মানে- জগত। বরযখ মানে- আড়াল। সুতরাং আলমে বরযখ মানে- আড়ালের জগত।

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মানুষের আত্মাসমূহকে যে জগতে রাখা হয়, তাকেই বলা হয় আলমে বরযখ। সাধারণ ও প্রচলিত অর্থে আলমে বরযখকে কবর বলা হয়।

আলমে বরযখের দুইটি ভাগ আছে: ইল্লীন ও সিজ্জীন। ইল্লীন মানে- সম্মান ও মর্যাদার জায়গা। সিজ্জীন মানে- হাজতখানা। যারা প্রকৃত মুসলিম ও নেককার হিসেবে ইনতিকাল করবে, তাদের আত্মা থাকবে ইল্লীনে। আর যারা আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী পাপিষ্ঠ হিসেবে মারা যাবে তাদের আত্মা থাকবে সিজ্জীনে।

ইল্লীন হলো আরামের জায়গা, আর সিজ্জীন হলো দুঃখ কষ্টের জায়গা।

ইল্লীনে রাখা আত্মাদের সকাল সন্ধ্যা জান্নাত দেখিয়ে বলা হবে, কিয়ামত ও বিচার অনুষ্ঠিত হবার পরে এই জান্নাতেই তোমাদের থাকতে দেয়া হবে। এ সংবাদ শুনে তাদের খুশি ও আনন্দ বেড়ে যাবে।

সিজ্জীনের আত্মাদের সকাল সন্ধ্যা জাহান্নাম দেখানো হবে। বলা হবে, বিচারের পর এই জাহান্নামেই তোমাদের ফেলা হবে। তখন তাদের মানসিক কষ্ট ও যাতনা বেড়ে যাবে।

এভাবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মৃত লোকদের আত্মাসমূহ আলমে বরযখের ইল্লীন ও সিজ্জীনে অবস্থান করবে। কেউ সেখানে সুখে থাকবে, আবার কেউ থাকবে দুঃখের মধ্যে।

৪. তিনটি প্রশ্নের জবাব

কার আত্মা ইল্লীনে থাকবে, আর কার আত্মা সিজ্জীনে থাকবে- মৃত্যুর পর পরই তা ঠিক করা হবে। তা ঠিক করা হবে তিনটি প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে।

মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ কবরে রাখা হোক, পুড়িয়ে ফেলা হোক, কিংবা অন্য কোথাও ফেলে দেয়া হোক বা কোথাও পড়ে থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের আত্মা বা রূহটাই হলো আসল। আত্মার মৃত্যু নেই। দুনিয়াতে মানুষের যে মৃত্যু হয়, তা হয় দেহের মৃত্যু। আল্লাহর ফেরেশতারা মানুষের দেহ থেকে আত্মাকে বের করে নিয়ে যায়। সেজন্যেই মানুষের মৃত্যুকে 'ইনতিকাল' বলা হয়। ইনতিকাল মানে- স্থানান্তর।

অর্থাৎ মানুষের আত্মাকে তার দেহ থেকে আলমে বরযখে স্থানান্তর করা হয়।

এখানে ইল্লীন বা সিজ্জীনে নেয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলো হলোঃ

১. তোমার রব অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রভু, প্রতিপালক ও মালিক কে?
২. তোমার দীন অর্থাৎ জীবন যাপনের পদ্ধতি কী ছিলো?
৩. আর তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তিকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছিলেন, তিনি কে? তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

যারা এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে, তাদেরকে ইল্লীনে রাখা হয়। আর যারা সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকে রাখা হয় সিজ্জীনে। প্রশ্ন তিনটির সঠিক জবাব হলোঃ

জবাব-১ঃ আল্লাহ আমার রব। অর্থাৎ আমার স্রষ্টা, প্রভু, প্রতিপালক ও মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা।

জবাব-২ঃ আমর দীন হলো ইসলাম। অর্থাৎ আমি আল্লাহর দীন ইসলামের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করে এসেছি।

জবাব-৩ঃ তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.। আমি আমার জীবনের সমস্ত কাজে তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এসেছি।

- যারা খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করে ইনতিকাল করেন, তারাই এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন।

- যারা ইসলাম অনুযায়ী নিজেদের গোটা জীবনকে পরিচালিত করেনি এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সা. কে অনুসরণ করেনি, তারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে না। তারা বলে: 'হায়, আমিতো কিছুই জানি না।'

৫. কিয়ামত

অতপর একটি দিন আসবে, সেদিন মহান আল্লাহ গোটা বিশ্বজাহান ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল ফেরেশতা শিংগায় ফুঁক দেবেন। সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হয়ে পৃথিবী ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। পাহাড়সমূহ ধুনো তুলোর মতো উড়তে থাকবে। সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে। সমস্ত মানুষ আর সমস্ত প্রাণী মরে বিলীন হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি দিকবিদিক ছুটাছুটি করে বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সহসাই সবকিছু ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে।

তারপর আরেকবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন শুরু হবে আরেকটি নতুন দৃশ্য। তখন- এই পৃথিবী নতুন করে সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন এই পৃথিবী হবে আরো বহুগুণ প্রশস্ত ও বড়। তখন পৃথিবী হবে মিহি চাদরের মতো সমতল এক অতি বিশাল ময়দান।

তখন পুনরায় সমস্ত মানুষের দেহের মধ্যে আত্মা জুড়ে দেয়া হবে। আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত মানুষ নারী-পুরুষ তখন ভূগর্ভ থেকে দৌড়ে এসে সমবেত হবে নতুন পৃথিবীর বিশাল সমতল ময়দানে।

এই সমবেত হওয়াকে বলা হয় 'হাশর'। মানে- সম্মেলন, সমাবেশ বা সমবেত হওয়া। পৃথিবীতেই অনুষ্ঠিত হবে হাশর।

৬. বিচার ও প্রতিফল

হাশর ময়দানে মানুষের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। হিসাব হবে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের। ফায়সালা হবে- কে কী প্রতিফল পাবে? কে জান্নাতে যাবে, আর কে যাবে জাহান্নামে?

বিচারের ভয়ে সমস্ত মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। পাপিষ্ঠরা নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করবে। বলবে, অমুকে আমাকে বিপথগামী করেছে, অমুকের কারণে আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি। তারা সেদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকবে। সেদিন তারা পালাবার জায়গা খুঁজবে।

সেদিন ভাই ভাই থেকে পালাবে; বাপ সন্তান থেকে পালাবে; সন্তানরা বাপ থেকে পালাবে; স্বামী স্ত্রী থেকে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে পালাবে। কারণ, তারা

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করবে। অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেখানে পালাবে কোথায়? সেখানে পলাবার কোনো জায়গা থাকবে না।

সেদিন পাপিষ্টরা সবকিছুর বিনিময়ে, এমনকি একান্ত আপনজনের বিনিময়ে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুতেই তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা থাকেন। তারা তার সমস্ত আমল রেকর্ড করেন। হয়তো অডিও ভিজুয়াল রেকর্ড।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে তার কৃতকর্মের রেকর্ড খুলে রাখা হবে। বলা হবে, দেখো তোমার কৃতকর্মের রেকর্ড। আজ তুমি নিজেই নিজের বিচার করো। নিজের বিচারের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট।

পাপীদের রেকর্ড তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। রেকর্ড দেখে ভয়ে পাপীদের মুখ কালো হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ পাক বিচার শুরু করবেন। তিনি প্রতিটি পাপের বিচার করবেন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। তিনি কারো প্রতি একবিন্দু অবিচার করবেন না।

পাপীরা দুনিয়ার জীবনে যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করেছিল, তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে। যাদের তাবেদারি করেছিল, তাদেরকে ডাকবে। দুনিয়ায় থাকতে যারা সুপারিশ করে বেহেশতে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিল, তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু হায়, তারা কেউই তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। তারা বলবে, আজ তো তোমার এবং আমাদের একই অবস্থা। আসলে দুনিয়াতে আমরা সবাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।

এরপর আল্লাহ পাক পাপীদের যবান বন্ধ করে দেবেন। সাক্ষীদের ডাকা হবে। তখন তার হাত, তার পা, তার চামড়া এবং তার সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। দুনিয়াতে সে যাদেরকে বিপথগামী করেছিল তারা সবাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। দুনিয়াতে সে যাদের প্রতি যুলম করেছিল এবং যাদের হক ও অধিকার নষ্ট করেছিল তারা সবাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এমনকি যে যমীনের উপর চলাফেরা করে সে সমস্ত অপরাধ করেছিল, সেই যমীনও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

কোনো পাপিষ্টের জন্যে কেউই কোনো প্রকার সুপারিশ করবে না।

এভাবে রেকর্ড পত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের জন্যে জাহান্নামের জঘন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হবে।

অন্যদিকে যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া দীন ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে, সেখানে তাদের কোনো ভয়ও থাকবে না, কোনো দুশ্চিন্তাও থাকবে না। সেখানে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল।

দুনিয়ার সব নেককার দীনি ভাই বন্ধুরা সেখানেও পরস্পরের বন্ধুই থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলা লোকেরা সেখানে আল্লাহর দরবারে একজন আরেকজনের ভালো কাজের সাক্ষ্য দেবে। এই যমীন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করার কারণে আল্লাহর কুরআন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

তাদের কৃতকর্মের রেকর্ড সম্মানের সাথে তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা দেখবে, তাদের নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নেকীর পাল্লা ভারি হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের সহজ হিসাব নেবেন। সারাজীবন তারা শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করেছে, শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করেছে। আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা প্রানান্তর প্রচেষ্টা করেছে। তাই সেদিন আল্লাহ পাক তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবেন। কিছু গুনাহ্-খাতা হয়ে থাকলে সেগুলো থেকে তিনি তাদের পবিত্র করবেন।

তাদের সঙ্গে থাকা ফেরেশতারা তাদের নেক পথে চলার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। নবীর অনুসরণ করে জীবন যাপন করার কারণে নবী করীম সা. তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করার কারণে সেগুলোও তার পক্ষে সুপারিশ করবে। একজন নেককার লোকের জন্যে অন্যান্য নেককার লোকেরাও সুপারিশ করবে। তারা বলবে, হে আল্লাহ, এ তো আমাদের সাথেই চলেছে। এ নেক কাজ করেছে, দুনিয়ার জীবনে কেবল তোমারই হুকুম পালন করেছে, কেবল তোমারই সন্তুষ্টি চেয়েছে। তারপরও যদি ওর কোনো গুণাহ খাতা হয়ে গিয়ে থাকে, তুমি দয়া করে তাকে মাফ করে দাও।

এভাবেই আল্লাহ পাক খাঁটি মুমিনের নেক আমলের রেকর্ড এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে পাস করিয়ে দেবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

এভাবেই হাশর ময়দানে একেবারে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত এবং তাঁর অবাধ্য এই দুই ধরনের লোকদের তাদের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করবেন।

৭. জাহান্নামীরা জাহান্নামের পথে

বিচার ও প্রতিফল ঘোষণার পর প্রতিফল ভোগের জন্যে হাশর ময়দান থেকে জান্নাতী লোকেরা রওয়ানা করবে জান্নাতের দিকে। আর জাহান্নামীদের নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, পাপীদের লাগাম পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্ধকার পথে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ওদের নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

সামনেই রয়েছে পুলসিরাত। পাপীরা পুলসিরাত পার হতে পারবে না। সেখান থেকেই প্রবেশ করতে হবে তাদের জাহান্নামে। প্রবেশ পথে-

জাহান্নামের দারোয়ানরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে : পৃথিবীতে তোমাদের কাছে কি আল্লাহর বাণী নিয়ে লোকেরা যায়নি? তারা কি তোমাদের আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানায়নি? হক পথ ও বাতিল পথের কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরেনি? আল্লাহর পাঠানো হক পথে না চললে মৃত্যুর পর যে এই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা কি তারা তোমাদের বলেনি?

পাপীরা বলবে : হ্যাঁ তাঁরা বলেছিলেন এবং আল্লাহর পথে চলতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা শুনিনি, মানিনি। তখন পাপীদের বলা হবেঃ যাও প্রবেশ করো জাহান্নামে। চিরদিন পড়ে থাকো এই নিকৃষ্ট শাস্তির জায়গায়। ভোগ করো আযাব আর আযাব।

৮. জান্নাতীরা জান্নাতের পথে

বিচার শেষে প্রতিদান ঘোষণার পর জান্নাত লাভকারীরা মিছিল সহকারে রওয়ানা করবে জান্নাতের দিকে। অন্ধকার পথে তাদের মুখমণ্ডল ও হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। কারণ তারা আল্লাহকে সাজদা করেছিল, নামায পড়ার জন্যে বার বার অযু করেছিল। সেজন্যে তাদের কপাল ও অযুর অংগ প্রত্যংগ থেকে ঝলমলে আলো বের হতে থাকবে।

ঐ আলোতে তাদের আনন্দ মিছিল জান্নাতের পথ ধরে এগিয়ে যাবে। সহজেই তারা পার হয়ে যাবে পুলসিরাত। তাদের আগমনে খুলে দেয়া হবে জান্নাতের সমস্ত দরজা। জান্নাতের ফেরেশতারা সম্মানের সাথে সালাম ও স্বাগতম জানাবে তাদের। তারা বলবে : আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা চিরসুখী হোন। চির আনন্দে থাকুন। পৃথিবীর জীবনে আপনারা মজবুত হয়ে আল্লাহর পথে চলেছিলেন। তারই বিনিময়ে আল্লাহ পাক আপনাদের উপহার দিয়েছেন এই জান্নাত। তাই চিরদিনের জন্যে প্রবেশ করুন এই জান্নাতে।

তখন আল্লাহর এই নেক বান্দারা বলবেন : সমস্ত কৃতজ্ঞতা, শুকরিয়া ও প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। পৃথিবীর জীবনে কিতাব ও নবীর মাধ্যমে তিনি আমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন- তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করলে তিনি আমাদের জান্নাত দান করবেন। আজ তিনি তাঁর সেই ওয়াদা পূরণ করলেন। আজ তিনি

আমাদের জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সেখানে মনের খুশিতে বেড়াতে পারবো স্বাধীনভাবে সবখানে।

এভাবে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে পাপীরা যাবে জাহান্নামে আর আল্লাহর অনুগতরা যাবে জান্নাতে। আল্লাহ পাক কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফলই পাবে। আর জান্নাত এবং জাহান্নাম প্রতিফল ভোগেরই জায়গা।

৯. জাহান্নামের আযাব

আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী পাপীদের জন্যে জাহান্নামে নানারকম শাস্তি ও আযাবের ব্যবস্থা থাকবে। কুরআন ও হাদিসে সেসব শাস্তির বিশদ বিবরণ রয়েছে। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো :

আগুনে পোড়ানোর শাস্তি : পাপীদের প্রধানত আগুনে পোড়ানো হবে। জাহান্নাম এবং দোযখ মানেই অগ্নিকুণ্ড। তাদের আগুনের গহ্বরে ফেলে দেয়া হবে। গহ্ববরের মুখ ঢেকে রাখা হবে। আগুনের লেলিহান শিখার সাথে তারা ঘূর্ণির মতো ঘুরতে থাকবে। তাদের শরীরের বাহির এবং ভিতর ভয়ানকভাবে দগ্ধ হতে থাকবে। এভাবে জাহান্নামের তেজস্বী আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাদের চরম কঠিন শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত রাখবে। তবে তাদের মৃত্যু হবে না। তারা মৃত্যুকে ডাকবে। কিন্তু মৃত্যু আসবে না। পরকালের জীবনে মৃত্যু নেই।

খাদ্যের শাস্তি : আগুনে জ্বলতে জ্বলতে পাপীদের কঠিন পানির পিপাসা লাগবে। তারা পানি চাইবে। তখন অতি তেজী আগুনে লোহা গলিয়ে সেই গলিত তপ্ত লোহা তাদের খাওয়ানো হবে। সেগুলো মুখের কাছে আনতেই তাদের মুখ পুড়ে দগ্ধ হয়ে যাবে। যখন সেই গলিত পদার্থ মুখে ঢেলে দেয়া হবে, পেটের নাড়ি ভুড়ি দগ্ধ হয়ে সেগুলোর সাথে নিচের দিকে পড়ে যাবে।

জাহান্নামীরা চরম ক্ষুধায় আর্তনাদ করতে থাকবে। তখন পোড়া মানুষের রক্ত পুঁজ এনে তাদের খাইয়ে দেয়া হবে।

যাককুম গাছ তাদের খাওয়ানো হবে। এ গাছ জাহান্নামের আগুনে জন্ম হয়। কঠিন আটাযুক্ত কাঁটাওয়ালা এই গাছ খাওয়ানোর সাথে সাথে তাদের গলায় আঁটকে যাবে। গলা থেকে তা বেরও হবে না, ভিতরেও যাবে না।

রক্তসাগরে : কিছু পাপীকে রক্তের সাগরে নিক্ষেপ করা হবে। তারা আর্তনাদ করতে করতে রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে কিনারে আসার চেষ্টা করবে।

কিনারে আসার সাথে সাথে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতারা আবার তাদের ছুঁড়ে মারবে সমুদ্রের মাঝখানে। তারা আবার কূলে উঠার চেষ্টা করবে, আবার ছুঁড়ে মারা হবে সমুদ্রের মাঝখানে। এভাবেই চলতে থাকবে।

মাথা চূর্ণ করা হবে : কোনো কোনো পাপের জন্যে মাথা চূর্ণ করা হবে। পাপীর মাথা একটি পাথরের উপর রাখা হবে। ফেরেশতা আরেকটি বিশাল পাথর সজোরে তার মাথায় ছুড়ে মারবে। সাথে সাথে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। পাপীর চিৎকারে আকাশ বাতাস কম্পিত হবে। আবার তার মাথা জোড়া লাগবে। আবার পাথর মারা হবে। আবার চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে মাথা। আবার জোড়া লাগবে। এভাবেই চলতে থাকবে।

জিহ্বা কাটা হবে : ফেরেশতারা কিছু পাপীর জিহ্বা কাটবে। তাকে শুইয়ে দিয়ে তার জিহ্বা টেনে লম্বা করে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। জিহ্বা আবার এসে জোড়া লাগবে। আবার টেনে বের করে কেটে ফেলবে। আবার জোড়া লাগবে। আবার কাটবে। এভাবেই চলতে থাকবে।

কয়েক প্রকার শাস্তির কথা বললাম। কিন্তু সেখানে পাপীদের জন্যে হাজারো রকম শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। একেক রকম শাস্তি কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। প্রতিটি শাস্তি হবে চরম যন্ত্রণাদায়ক। এ শাস্তি থেকে তারা একদিনের জন্যেও রেহাই পাবে না। তাদের শাস্তি কখনো হালকা করা হবে না। সেখানে তারা আযাব, অপমান আর লাঞ্ছনার মধ্যে চিরকাল ডুবে থাকবে।

১০. জান্নাতের সুখ ও আনন্দ

জান্নাত মানে- উদ্যান। আল্লাহর অনুগত বান্দারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা দেখতে পাবে, তাদের একেকজন বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক। সীমাহীন ভোগ বিলাসের সামগ্রী তাদের দেয়া হবে। সেখানে-

- তারা যা চাইবে তাই পাবে।
- পাবে আলীশান অট্টালিকা, বিরাট বিরাট প্রাসাদ।
- ফলের ফুলের বাগান আর বাগান।
- সাজানো সব বাগানের গাছের নিচ দিয়ে চির বহমান থাকবে ঝর্ণধারাসমূহ।
- থাকবে নানা রং আর নানা খুশবুওয়ালা শরবতের ঝর্ণাধারা।
- থাকবে গাছে গাছে ফল-আংগুর-আনার, আরো হাজারো রকম ফল।
- থাকবে হুর-গিলমান, সেবক-সেবিকা।
- তাদের পরানো হবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক।
- পরানো হবে মখমল আর কিংখাবের পোশাক।

- পরানো হবে সোনার অলংকার।
- জান্নাতে সূর্যের রোদও থাকবে না। শীতের প্রকোপও থাকবে না, থাকবে কেবল চির বসন্ত।
- জান্নাতে কেউ বুড়ো হবে না। সবাই থাকবে চির যুবক, চির যুবতী।
- তাদের পরিবেশন করা হবে তাদের ইচ্ছেমতো মজাদার মজাদার পাখির গোশত। নানা স্বাদের খাদ্য।
- তারা যেখানে যেতে চাইবে, যেতে চাইবে যতোদূর, যেতে পারবে নিমিশেই।

১১. কী কারণে জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে?

যে মহান আল্লাহ দয়া করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান, বৃদ্ধি, বিবেক ও যোগ্যতা দান করেছেন। আরো দিয়েছেন অসংখ্য নিয়ামত। সেই মহান দয়াময় স্রষ্টাকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তাঁর হুকুম অমান্য করে চলে, জাহান্নামই হলো তার উপযুক্ত প্রতিদান। মানুষ জাহান্নামে যাবে-

- আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে।
- আল্লাহর সাথে শিরক করার কারণে।
- আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে।
- পরকালের প্রতি উদাসীন থাকার কারণে।
- মুনাফিকী করার কারণে।
- রসূলকে সা. অম্যান্য করার কারণে।
- রসূলকে সা. অনুসরণ না করার কারণে।
- কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপন না করার কারণে।
- আল্লাহর হুকুম ও আইন অমান্য করার কারণে।
- আল্লাহর হুকুম মতো পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা না করার কারণে।
- আল্লাহর দীন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম না করার কারণে।
- মানুষের উপর যুলুম করার কারণে।
- মানুষের অধিকার হরণ করার কারণে।
- আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকার কারণে।
- নামায না পড়ার কারণে।
- অসহায়দের সাহায্য সহযোগিতা না করার কারণে।
- দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করার কারণে।

এসব কথাই বলা হয়েছে আল কুরআনে।

১২. যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে

যেসব লোক তাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পেরেছে, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে এক ও একক বলে মেনেছে। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করেনি এবং কেবলমাত্র তাঁরই হুকুম মতো জীবন যাপন করেছে, জান্নাত হবে তাদের চিরসুখের আবাস। মানুষ জান্নাতে যাবে-

- এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে।
- পরকালের প্রতি ঈমান আনার কারণে।
- পরকালীন মুক্তির জন্যে কাজ করার কারণে।
- রসূলকে সা. মানা ও অনুসরণ করার কারণে।
- ইসলামের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করার কারণে।
- আল্লাহর আইন ও হুকুম অমান্য না করার কারণে।
- কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপনের কারণে।
- আল্লাহর নিষেধ করা সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকার কারণে।
- হিসাবের দিনের ভয়ে ভীত থাকার কারণে।
- আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসার কারণে।
- আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করার কারণে।
- সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্যে চেষ্টা করার কারণে।
- জান্নাত পাওয়াকে বৈষয়িক স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে।
- কারো অধিকার নষ্ট না করার কারণে।
- কামনা বাসনা ও লোভ লালসাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কারণে।

* * *

১৯

দৈনন্দিন জীবনে কুরআন হাদিস যিক্‌র দু'আ

এ বইতে আমরা এ যাবত ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি। এ যাবতকার আলোচনা থেকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. মানুষ এবং গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, প্রভু, প্রতিপালক এবং একচ্ছত্র শাসক হচ্ছেন আল্লাহ।

২. আল্লাহ এক এবং একক। কোনো দিক থেকেই কেউ এবং কোনো কিছু মহান আল্লাহর অংশীদার নয়।

৩. মুহাম্মদ সা. আল্লাহর আখেরি রসূল। একমাত্র তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহকে জানা, মানা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

৪. আখিরাতের মুক্তি ও সাফল্যই মানব জীবনের প্রকৃত মুক্তি ও সাফল্য।

৫. আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করার জন্যে, তাঁর মর্জি মতো চলার জন্যে।

৬. ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি। ইসলাম আল্লাহর আনুগত্যের বিধান।

৭. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-যা মানুষের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে এসেছে।

৮. ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের পার্থিব জীবনের শান্তি ও কল্যাণ, আর পরকালীন জীবনের সাফল্য।

পুরো বইতে এই বিষয়গুলো আলোচিত হবার পর এবার মুখস্ত করা এবং অনুশীলন করার জন্যে কুরআনের কিছু আয়াত এবং কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো। সেই সাথে দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করার জন্যে কিছু যিকর আযকার এবং দু'আ লিপিবদ্ধ করা হলো। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভের পথ সুগম হবে ইনশাল্লাহ।

১. দৈনন্দিন জীবনে কুরআন

এখানে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং আয়াতাংশ উল্লেখ করা হলো। এ আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো মূলত মুখস্ত করার জন্যে। এগুলোতে ঈমান, তাওহীদ, ইসলাম, জ্ঞানার্জন, ইসলামের মৌলিক বিধান, পারস্পরিক

সম্পর্ক এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। যিনি এ আয়াতগুলো মুখস্ত করবেন :

১. এর আলোকে নিজেকে গড়ে নিতে তার জন্যে সহজ হবে।

২. এর আলোকে অন্যদের দাওয়াত প্রদান করতে এবং আহ্বান জানাতে তার জন্যে সহজ হবে।

তাহলে এবার আসুন, আয়াতগুলো বারবার পড়ি, মুখস্ত করি এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলন করি।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অর্থ : (হে নবী!) মানুষকে জানিয়ে দাওঃ তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। -সূরা ১১২ আল ইখলাস : আয়াত ১।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

অর্থ : পড়ো তোমার সেই মহান প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। -সূরা ৯৬ আল আলাক : আয়াত ১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অর্থ: আরম্ভ করছি আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়। -সূরা ১ আল ফাতিহা : আয়াত ১।

اَللّٰهُ لاَ اِلٰه اِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫৫।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ, যিনি মহাজগতের মালিক, পরিচালক ও প্রতিপালক। অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময় তিনি। -সূরা ১ আল ফাতিহা : আয়াত ২-৩।

فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا

অর্থ : অতএব, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, আর সেই আলোর (আল কুরআনের) প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি। -সূরা ৬৪ আত তাগাবুন : আয়াত ৮।

وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

অর্থ : বরং সঠিক কাজ হলো ঐ ব্যক্তির কাজ, যে ঈমান আনলো আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি।' -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭৭।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমার দাসত্ব-আনুগত্য ও হুকুম পালন করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি মানুষ আর জ্বিন সৃষ্টি করিনি। -সূরা ৫১ আল যারিয়াত : আয়াত ৫৬।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন (জীবন-যাপনের পদ্ধতি)। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৯।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ : তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ করো। -সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৩৬।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : ওদের জিজ্ঞেস করো: যারা জানে (যারা জ্ঞানী) আর যারা জানে না (যারা অজ্ঞ)- এই উভয় ধরনের লোক কি এক রকম? -সূরা ৩৯ আল জুমার : আয়াত ৯।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ : আল্লাহকে তারাই ভয় করে (মেনে চলে), তাঁর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী। -সূরা ৩৫ আল ফাতির : আয়াত ২৮।

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

অর্থ : আর মানুষের সাথে উত্তম ও চমৎকার কথা বলো। -সূরা ২ বাকারা : ৮৩।

انَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

অর্থ : আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন সুবিচার এবং পরোপকার করার। -সূরা ১৬ আল নহল : আয়াত ৯০।

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

অর্থ : আর (মানুষের প্রতি) দয়া করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। -সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৭৭।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, কারণ প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবশ্যি জিজ্ঞাসা করা হবে। -সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৩৪।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই। -সূরা ৪৯ আল হুজুরাত : আয়াত ১০।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থ : যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। -সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৩।

وَلَلاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى

অর্থ : প্রথম জীবনের চেয়ে শেষের জীবনই (দুনিয়ার চাইতে আখিরাতই) তোমার জন্য উত্তম। -সূরা ৯৩ আদ দোহা : আয়াত ৪।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

অর্থ : হে ঐসব লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো এবং (জীবনের কোনো ক্ষেত্রে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। -সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৮।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا

অর্থ: তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু (আল কুরআনকে) শক্ত করে ধরো এবং কিছুতেই বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হয়ো না। -সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

২. দৈনন্দিন জীবনে হাদিস

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. এর কয়েকটি হাদিস লিপিবদ্ধ করা হলো। অর্থসহ হাসিদগুলো মুখস্ত করলে জীবন চলার পথে কাজে লাগানো যাবে।

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

অর্থ : বলো : আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; অতপর এ কথার উপর অটল থাকো। -সহীহ মুসলিম।

اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ

অর্থ : সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব। -সহীহ মুসলিম।

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ الَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا

অর্থ : রাতে কিছু সময় জ্ঞানচর্চা করা সারারাত জেগে (ইবাদতে নিরত) থাকার চেয়ে উত্তম। -দারমি।

تَمَسَّكُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا

অর্থ : কুরআনকে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো বিপথগামী হবে না। -মিশকাত।

خَيْرُ الْهَدِىْ هَدْىُ مُحَمَّدٍ

অর্থ : সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি। -সহীহ মুসলিম।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : কাজের প্রতিদান নির্ভর করে নিয়্যতের উপর -সহীহ বুখারি।

لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخَلْقِ

অর্থ : উত্তম চরিত্রের চাইতে বড় মর্যাদা আর নেই। -মিশকাত।

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ

অর্থ : জ্ঞানের মাথা হলো আল্লাহকে ভয় করা। -মিশকাত।

مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ

অর্থ : যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট (ইবনে মাজাহ)

حُسْنُ الظَّنِّ مِنَ الْعِبَادَةِ

অর্থ : সুধারণা করা একটি ইবাদত। -মুসনাদে আহমদ।

اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُه وَلاَ يَخْذُلُه

অর্থ : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলম করে না এবং তাকে অপমানিতও করে না। -সহীহ মুসলিম।

لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

অর্থ : যে তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। -তিরমিযি।

مَنِ اسْتَوٰى يَوْمَاه فَهُوَ مَغْبُوْنٌ

অর্থ: যার দুটি দিন সমান গেলো, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। -দায়লমী।

اَلصِّبْيَانُ مِنْ رَيْحَانِ اللهِ

অর্থ : শিশুরা আল্লাহর ফুল। -তিরমিযি।

قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا

অর্থ : সত্য কথা বলো, যদিও তা তিক্ত। -ইবনে হিব্বান।

اَفْشُوْ السَّلَامُ بَيْنَكُمْ

অর্থ : তোমাদের মাঝে সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রচলন করো। -সহীহ মুসলিম।

الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

অর্থ : মনের প্রাচুর্যই আসল প্রাচুর্য। -সহীহ বুখারি।

৩. সার্বক্ষণিক যিকর-আযকার

যিকর মানে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা। যিকরের বহুবচন-আযকার।

একজন মুসলিমের জন্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং জীবন যাপনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহকে স্মরণ করা কর্তব্য। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে, খেতে, ঘুমোতে, জাগতে, সাক্ষাতে, একাকীত্বে, সমষ্টিতে সবসময় আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকা উচিত একজন মুসলিমের যবান।

একজন মুসলিম কিভাবে সবসময় স্বরণ করবে আল্লাহকে? হ্যাঁ, স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. আমাদের জানিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন সেইসব যিকির-আযকার। এখানে কিছু যিকির-আযকার উল্লেখ করা হলো:

১. সব সময় বলা এবং মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও বুঝানোর জন্যে :

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (হুকুমদাতা, আইনদাতা, ত্রাণকর্তা ও ফরিয়াদ শ্রবনকারী) নাই।

২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার জন্যে :

اللهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩. আল্লাহকে সকল প্রকার ক্রটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র ঘোষণার জন্যে :

سُبْحَانَ اللهِ

অর্থ : আল্লাহ্ সকল প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত পবিত্র।

৪. আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰه

অর্থ : সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে।

৫. বিপদ দেখা দিলে বলতে হয় :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُوْن

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো।

৬. বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِيْمِيْن

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ত্রাণকর্তা এবং বিপদ দূরকারী নেই। সমস্ত ক্রটি ও অক্ষমতা থেকে তুমি মুক্ত, আর আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি।

৭. যে কোনো ভালো, শুভ ও সুন্দর কাজ আরম্ভ করার সময় :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু।

৮. কোনো লোকালয়ে ও কোনো কাজে প্রবেশ করলে, কোনো কিছু ক্রয় করলে এবং কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করলে বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

অর্থ : হে আল্লাহ! এখানে/ এতে আমাদেরকে কল্যাণ ও প্রাচুর্য দান করো।

৯. ঘর থেকে বের হবার সময় বলতে হয় :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে (যাত্রা) শুরু করছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি। ভালো-মন্দ কোনো কিছু করার শক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।

১০. ঘরে প্রবেশের সময় এবং কারো সাথে সাক্ষাত হলে সালাম বলতে হয় :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ : আপনার/আপনাদের প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

১১. সালামের জবাবে বলতে হয় :

وَعَلَيْكُمُ اَلسَّلَام وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ : আপনার/আপনাদের প্রতিও বর্ষিত হোক শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং বরকত।

১২. ঘুমোতে গেলে বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بِأَسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামে আমার মৃত্যু (নিদ্রা) এবং আমার জীবিত হওয়া (জেগে উঠা)।

১৩. ঘুম থেকে উঠে বলতে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ

অর্থ : শোকর সেই মহান আল্লাহর যিনি মৃত্যুর (ঘুমানোর) পর আবার আমাকে জীবিত করলেন (জাগিয়ে তুললেন) এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো।

১৪. সকাল এবং সন্ধ্যায় বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশেই আমাদের সকাল হয় এবং সন্ধ্যা হয়। তোমার নির্দেশেই আমরা বেঁচে আছি এবং আমরা মৃত্যুবরণ করি।

১৫. কোনো অন্যায়, অপরাধ ও ক্রুটি করে ফেললে বলতে হয় :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ

অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

১৬. ক্রোধ দেখা দিলে বলতে হয় :

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

১৭. বিপদের অবস্থা বর্ণনা দিতে কিংবা মন্দ খবর শুনলে বলতে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থ : সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর।

৪. দৈনন্দিন দু'আ

আল্লাহর সাহায্য ও করুণা লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো দু'আ। একজন মুসলিমের উচিত সব সময় আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং দু'আ করা। আমাদের প্রিয় নবী সা. বলেছেন : দু'আ ইবাদতের মগজ।' তিনি আরো বলেছেন : 'তোমরা যখন কিছু চাইবে সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইবে।' দু'আ নিজের মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে নিজের ভাষায় করাই উত্তম। তবে অর্থ জানা থাকলে কুরআন এবং হাদিসে উল্লেখিত দু'আও করা যায়। এখানে কুরআন হাদিসের কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হলো :

১. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে দু'আ :

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থ : প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।

২. পিতা মাতার জন্যে দু'আ :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا

অর্থ : আমার প্রভু! আমার পিতা মাতার প্রতি রহম করো, যেভাবে ছোটবেলা থেকে তারা আমাকে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করেছেন।

৩. ক্ষমা ও রহমতের জন্যে দু'আ :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ : প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর আমার প্রতি রহম করো। তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

৪. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যে দু'আ :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো আর আমাদের রক্ষা করো দোযখের শাস্তি থেকে।

৫. অন্যায় করে ফেললে ক্ষমা চাওয়ার দু'আ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ : প্রভু আমি তো নিজের উপর অন্যায় করে ফেলেছি। এখন যদি তুমি আমাকে ক্ষমা ও রহম না করো তবে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

৬. আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ

অর্থ : আমার আল্লাহ! আমি তোমার ভালবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা চাই।

৭. দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা ও ক্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ والْحُزْنِ الْعِجْزِ والْكَسْلِ والْجُبْنِ والْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দুশ্চিন্তা থেকে, মনোকষ্ট থেকে, বার্ধক্যের অচল অবস্থা থেকে, আলস্য ও কাপুরুষতা থেকে এবং কৃপণতা ও ঋণের বোঝা থেকে।

৮. সঠিক পথ ও কল্যাণ লাভের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْهُدٰى والتُّقٰى والْعَفَافَ والْغِنٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই হিদায়াত, আল্লাহভীতি, পবিত্র জীবন এবং প্রাচুর্য।

৯. ক্ষমা রহমত ও রিযিক লাভের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى واهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِى

অর্থ : ওগো আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে স্বস্তি দান করো এবং আমাকে জীবিকা দাও।

১০. পাপ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ :

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। তুমি আমাদের গুণাহ্খাতা মাফ করে দাও। আর জান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।

১১. যানবাহন থেকে অবতরণ এবং সম্মান সমাদর লাভের দু'আ :

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

অর্থ : প্রভু! বরকতপূর্ণ স্থানে বা সম্মানের সাথে আমাদের অবতরণ করাও। আর তুমিই তো সর্বোত্তমভাবে অবতরণ করানে ওয়ালা।

১২. আল্লাহর সাহায্য ও দয়া লাভের দু'আ :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ : ওগো আমাদের অভিভাবক! আমরা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম আর তুমিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল।

১৩. রোগ নিরাময়ের দু'আ : رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ : প্রভু! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

১৪. শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্যের জন্যে দু'আ:

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ : প্রভু! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করো। আমাদের কাজে কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘিত হয়েছে মাফ করে দাও। আমাদের কদম মজবুত করে দাও। আর কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।

১৫. জান্নাতে বাসস্থানের জন্যে দু'আ : رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِیْ الْجَنَّةِ

অর্থ : প্রভু! তোমার নিকট জান্নাতে আমাকে একটি ঘর বানিয়ে দাও।

১৬. মুসলিম হিসেবে মৃত্যু লাভের দু'আ :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও এবং আমাদের ওফাত দান করো তোমার অনুগত অবস্থায়।

১৭. বিচারের দিন সহজ হিসাব নেয়ার দু'আ : اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থ : আমার আল্লাহ! আমার যখন হিসাব নেবে, সহজ করে নিও।

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাঃ ০১৭৫৩-৪২২২৯৬